কাজলের দিনরাত্রি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

নাস্তার টেবিলে বসে গত দশ মিনিট থেকে আমি এক স্লাইস টোস্ট খাওয়ার চেষ্টা করছি আর এর মাঝে আমার আব্বু চার স্লাইস টোস্ট, আধখানা মাখনের কিউব, প্রায় আধ বোতল জেলি, দুইটা ডিম, দুই গ্লাস অরেঞ্জ জুস আর দুই টুকরা পেঁপে খেয়ে ফেলেছেন। কফি মেশিন থেকে বড় একটা মগে কফি ঢেলে সেখানে একটা চুমুক দিয়ে তার হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি এখনো এক স্লাইস টোস্টের মাঝেই আটকা পড়ে আছি। আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী হল? তুমি খাচ্ছ না যে?"

আমার আব্বুর সাথে দেখা সাক্ষাত বা কথাবার্তা হয় খুব কম, তাই তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা ভদ্রতার সম্পর্কের মতো। আমি টোস্টের এক কোনায় আরেকটা কামড় দিয়ে বললাম, "চেষ্টা করছি।"

আব্বু খুব গম্ভীর মুখে বললেন, "দিনের সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট মিল হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট ঠিক করে না খেলে কেমন করে হবে?"

আমি কোন কথা না বলে টোস্টের টুকরাটা চিবিয়ে নরম করে গেলার চেষ্টা করতে থাকি। আব্বু সব সময় অসম্ভব ব্যস্ত থাকেন, আমার সাথে দেখা–সাক্ষাৎ হয় এতো কম যে সেজন্যে বলতে গেলে আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সকালে নাস্তা করাটা আমার জন্যে একটা যন্ত্রণার মতো—সেটা এখন তাকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমি তাই সেই চেষ্টা না করে টোস্টে আরো একটা কামড় দিলাম।

আব্বু আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মনে হল বেশ একটু অবাক হয়ে বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে তোমার খেতে কষ্ট হচ্ছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "তা একটু হচ্ছে।"

আমার কথা শুনে আব্বু মনে হল রীতিমত চমকে উঠলেন, একজন মানুষের সকালে নাস্তা করতে কষ্ট হতে পারে ব্যাপারটা মনে হয় আব্বু চিন্তাও করতে পারেন না। অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! কেন?"

আম্মু তার নীল রংয়ের পোর্সেলিনের কাপে খেলনার মতো একটা টি–পট থেকে চা ঢালছিলেন, টি–পটটা টেবিলে রেখে আমি কিছু বলার আগেই একটা মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "কারণ এটা একটা ঢং! আমাদের লাট সাহেব কাজল বেলা এগারোটার আগে কিছু খেতে পারেন না। তার গলায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে।"

আব্বুর সাথে আমার যেরকম একটা ভদ্রতার সম্পর্ক, আম্মুর সাথে ঠিক তার উল্টো। পরীক্ষার আগে বাড়াবাড়ি সিরিয়াস ছাত্রছাত্রীরা যেরকম পুরো বই মুখস্থ করে বসে থাকে আমার আম্মুও মনে হয় আমাকে সেভাবে দাড়ি কমা সহ মুখস্থ করে ফেলেছেন। কিছু বলার জন্যে মুখ খোলার আগেই আমি কী বলব আম্মু বুঝে যান, আমার চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় ভেতরের সবকিছু আম্মু দেখে ফেলছেন। তার কাছে আমার গোপন বলতে কিছু নাই। আব্বুর সাথে যেরকম ভদ্রতার একটা সম্পর্ক রাখতে হয় আম্মুর বেলায় তার কোন দরকার নেই—আম্মু আমাকে এক চোট নিলে আমি সাধারণত তাকে ছেড়ে দিই না।

এবারেও ছেড়ে দিলাম না, বললাম, "আম্মু, তুমি তাহলে কিছু না খেয়ে এখন খালি এক কাপ চা খাচ্ছ কেন?"

"আমি চা খাই না কেরোসিন খাই, তাতে তোর কী?"

"তুমি বলছ এগারোটার আগে আমার গলায় ট্রাফিক জ্যাম থাকে। তোমার কী থাকে জান?"

আম্মু চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী থাকে?"

"হরতাল। কেন হরতাল বুঝেছ?"

"কেন?"

"আমি তো তবু চেষ্টা করি ট্রাফিক জ্যাম ছুটিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে! তুমি চেষ্টাও করে না। তোমার হচ্ছে পুরোপুরি হরতাল।"

"আমি কী তোর মতো স্কুলে যাচ্ছি? আমি কী তোর মতো টিনএজার? আমার কী এতে খাওয়া দরকার? সারাদিন বাসায় থাকি কোন কাজকর্ম নাই, আমার এই এক কাপ চা খাওয়াও ঠিক না! তাই বলে তুই খাবি না কেন?"

"ছেলেমেয়েরা হয় বাবা কিংবা মায়ের মতো। আমি হয়েছি তোমার মতো। তুমি সকালে উঠে কিছু খেতে পার না— আমিও পারি না।" আমি যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী তুমি।"

আম্মু ধমক দিয়ে বললেন, "লেকচার বন্ধ করে এখন খা।"

এটা হচ্ছে আম্মুর এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যুক্তিতর্কে যখন এগুতে পারেন না তখন এক ধমক দিয়ে চ্যাপ্টার ফিনিস করে দেন। আব্বু সামনে বসে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তা না হলে আমি আম্মুকে ঘায়েল করার আরো একটু চেষ্টা করতাম। জিনেটিক্স, ডি.এন.এ, জিন্স এসব নিয়ে কথা বলে আম্মুকে আরো খেপিয়ে দেয়া যায়, আম্মু মাঝে মাঝে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন—ভারি মজা হয় তখন। আব্বু অবশ্যি আমাদের কথায় কোন মজা খুঁজে পেলেন না, খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "কিন্তু এটা তো সিরিয়াস ব্যাপার।"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কোনটা?"

"এই যে সকালে খেতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই সিরিয়াস একটা ডিজ-অর্ডার। ঢাকায় তা ভালো স্পেশালিস্টও নাই। নেক্সট টাইম যখন সিঙ্গাপুর কিংবা—"

আম্মু আব্বুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই সিরিয়াস ডিজ-অর্ডার নিয়ে যখন তেরো বছর পার করে দিয়েছি বাকিটাও পারবো। এই ডিজ-অর্ডার ঠিক করার জন্যে স্পেশালিস্ট লাগে না।"

"তাহলে কী লাগে?"

"সকাল-বিকাল কান ধরে আচ্ছা মতোন দুইটা ঝাঁকুনি দিলে দুইদিনে সিধে হয়ে যাবে।"

আব্বু রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, "এতো বড় ছেলের কান ধরে ঝাঁকুনি দিবে মানে?"

"কাজল আবার বড় হল কোনদিন? দরকার হলে বিয়ের পর কাজল আর তার বউয়ের দুজনের কান এক সাথে ধরে টেনে দিয়ে আসব।"

কথা শুনে মনে হতে পারে আম্মু ঠাট্টা করছে কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আম্মুর জন্যে এইটা অসম্ভব কিছু না। ভদ্রতা করে আমার বউয়ের কান ধরে হয়তো টানবে না কিন্তু

আমার জীবন নিয়ে কোন গ্যারান্টি নেই। আমার আর আম্মুর মাঝে আব্বু অনেকটা বাইরের মানুষের মতোন, আবার ভদ্রতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখন তার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল। আব্বু কানে লাগিয়ে মুখ না খুলে নাক দিয়ে এক রকম শব্দ করলেন, "উঁ।"

একজন মানুষের যখন অনেক ক্ষমতা হয় তখন নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলতে হয়। অন্য পাশ থেকে কে কী বলছে কিছু বোঝা গেল না, আব্বু একবারও মুখ না খুলে নাক দিয়ে "উঁ" শব্দ করে গেলেন। কথা শেষ হবার আগে শিষ দেওয়ার মতো একটা শব্দ করলেন যার অর্থ হয়তো কয়েক কোটি টাকার একটা বিজনেস ডিল হয়ে গেছে কিংবা কে জানে হয়তো কয়েক কোটি টাকার বিজনেস ডিল হাত ছাড়া হয়ে গেছে—আব্বুর এতো টাকা যে কয়েক কোটি টাকা এদিক সেদিক হলে কিছু আসে যায় না। আব্বু তার মোবাইল টেলিফোনে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে। বুকিং দাও।"

মোবাইল টেলিফোনটা টেবিলে রেখে আব্বু একটু অপরাধীর মতো আম্মুর দিকে তাকালেন, আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কীসের বুকিং?"

আব্বু জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "একটু সিঙ্গাপুর যেতে হবে। ইমার্জেন্সি!"

"কখন?"

"দুপুরে একটা ফ্লাইট আছে।"

আম্মু কিছু না বলে তার সুন্দর নীল পোর্সেলিনের কাপে একটা চুমুক দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল আম্মু হয়তো খুব সূক্ষ্ম একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। আম্মু আমাকে দাড়ি কমাসহ মুখস্থ করে রেখেছেন আমি এখনো আম্মুকে মুখস্থ করতে পারি নি, কিন্তু মনে হয় এতদিনে একটু একটু পড়তে শিখেছি। আমার কেন জানি মনে হয় আব্বু আর আম্মু যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন। আব্বু অবশ্যি আম্মুর সেই সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা ঠিক করতে করতে বললেন, "সিঙ্গাপুরের সব কিছু সহ্য করা যায় শুধু একটা জিনিস সহ্য করা যায় না।"

আম্মু কিছু বললেন না, আব্বু একটু অপেক্ষা করে বললেন, "ওদের ইংরেজি, চিংকি টাইপের একটা ইংরেজি আছে। সেটা না চিংকি না ইংরেজি।"

আব্বু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাবার পর আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু, চিংকি মানে কী?"

আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর আব্বু চাইনিজ মানুষদের ইয়ারকি করে বলে চিংকি।"

আম্মু ইয়ারকি শব্দটাতে অনাবশ্যক জোর দিলেন, আমি একটু ভয়ে ভয়ে আম্মুর দিকে তাকালাম, আম্মু পাথরের মতো মুখ করে বললেন, "তোর আব্বু আরও অনেক কিছু বলে যার সবগুলো তোর জানার দরকার নেই।"

আমি বসে বসে টোস্টের টুকরোটা চিবুতে লাগলাম আম্মু তার নীল রংয়ের সুন্দর কাপে চা খেতে লাগলেন। শুনতে পেলাম দোতালায় আব্বুর ঘরে সিদ্দিক ভাই তার স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছেন। একজন মানুষ যেভাবে বাথরুমে যায় আব্বু সে ভাবে বিদেশ যান—কাজেই

কী করতে হবে না করতে হবে সিদ্দিক ভাই সব কিছু জানেন। সিদ্দিক ভাই আমার জন্মের আগে থেকে এই বাসায় আছেন। এই বাসায় সিদ্দিক ভাই খুব দরকারি একজন মানুষ।

গাড়িতে বসে আমি ড্রাইভার চাচাকে একটা সিডি দিয়ে বললাম, "ড্রাইভার চাচা, এইটা লাগান।"

লিথকিন পার্কের সুর বেজে উঠতেই ড্রাইভার চাচা বললেন, "এইগুলো শুনে যে কী মজা পান!"

আমি গানের তালে হাত-পা এবং মাথা নাড়ছিলাম সেই অবস্থাতেই বললাম, "আপনি এসব বুঝবেন না চাচা।"

"সেটা তো বুঝবই না।" ড্রাইভার চাচা রিয়ার ভিউ মিররে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "সত্যি করে বলেন দেখি ছোট সাহেব—"

"কী?"

"এইসব শুনে সত্যি আপনার মজা লাগে?"

"কেন মজা লাগবে না?"

"সেইটাই তো বুঝি না। খালি দেখি চিৎকার আর চেঁচামেচি।"

আমি গানের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, "আপনি এইসব বুঝবেন না। আম্মুর প্যানপ্যানানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে শুনে আপনার কান পচে গেছে।"

"বেগম সাহেব যদি শুনেন যে আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্যানপ্যানানি বলেছেন তাহলে আপনার খবর আছে।"

আমি দাঁত বের করে হাসলাম, ড্রাইভার চাচা ঠিকই বলেছে। আম্মু রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কিছু শুনেন না—কেউ সেই গানের সমালোচনা করলে যা একটা লেকচার দেন যে সেটা শুনে মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হয়।

স্কুলের সামনে গাড়িটা থামতেই আমি বললাম, "ড্রাইভার চাচা সিডিটা বের করে রাখবেন। খুব সাবধান—আবার স্ক্র্যাচ না পড়ে যায়। অরিজিন্যাল সিডি—আব্বু লন্ডন থেকে এনেছেন।"

ড্রাইভার চাচা মাথা নাড়লেন, বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি বের করে রাখব।"

গাড়ি থেকে বের হতেই গরম বাতাসের একটা হালকা লাগল—কী ভয়ানক গরম পড়েছে! আসলেই গরম নাকী এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ি থেকে বের হয়েছি বলে গরম লাগছে কে জানে। আমি ব্যাকপেক, পানির বোতল, দুই চারটা সিডি বইপত্র হাতে নিয়ে নামলাম, ড্রাইভার চাচা আমাকে একটু সাহায্য করার চেষ্টা করলেন, আমি কোন সুযোগ দিলাম না। নভেম্বর মাসে আমার বয়স হয়েছে তেরো—আমি লুতুপুতু ছেলে না যে সব কাজে সাহায্য করতে হবে।

স্কুলের গেট দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম, নতুন বিল্ডিংটা ভারি চমৎকার— দেখে মনেই হয় না এটা বাংলাদেশের বিল্ডিং। বাইরে বড় মাঠ, ছোট বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। এক পাশে বাস্কেটবল কোর্ট এর মাঝেই দুইটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে খেলছে। আমি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম, আমাদের ক্লাসরুম তিন তলায়, তাড়াতাড়ি

গেলে জানালার কাছে একটা সিট পাওয়া যায়। ক্লাসরুমের ভেতরে নতুন পেইন্টের গন্ধ, ফার্নিচারগুলো ঝকঝক করছে, টাইলস দেয়া মেঝে সব মিলিয়ে এতো সুন্দর যে বলার মতো নয়। স্যার আর ম্যাডামরাও যদি স্কুল আর স্কুলের বিল্ডিংয়ের মতো হতো তাহলে কী মজাটাই না হতো! অনেক টাকা দিয়ে অনেক সুন্দর বিল্ডিং তৈরি করা যায় কিন্তু মনে হয় অনেক টাকা দিলেই ভালো স্যার আর ভালো ম্যাডাম পাওয়া যায় না।

আমাকে দেখেই ক্লাসের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলো হৈ হৈ করে উঠল। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি অন্য দশটা ছেলেমেয়ে থেকে আমাকে সবাই বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি এমন কিছু ভালো ছাত্র নই, আমি খেলাধুলাতেও আহামরি কিছু না, গানও গাইতে পারি না, নাটকও করি না দেখতেও আমি এমন কিছু হ্যান্ডসাম না, তারপরেও সবাই আমাকে খুব গুরুত্ব দেয়, তার একটাই কারণ—আমার আব্বু হচ্ছেন দেশের সবচেয়ে বড়লোক মানুষগুলোর একজন। আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তো চিনেই, দেশের সাধারণ মানুষজনও চিনে। আব্বুর নাম হচ্ছে আলতাফ নবী, শুধু নাম বললে সবাই নাও চিনতে পারে কিন্তু যদি বলা হয় আলতাফ গার্মেন্টেসের আলতাফ নবী কিংবা আলতাফ কনস্ট্রাকশনের আলতাফ নবী, কিংবা আলতাফ সিমেন্টের আলতাফ নবী তাহলে সবাই এক ডাকে চিনে ফেলবে। ব্যাপারটা আসলেই ভয়ংকর—যখন একজন মানুষ জানতে পারে যে আমি আলতাফ নবীর ছেলে তখন তাদের চোখ গোল আলুর মতো বড় বড় হয়ে ওঠে এবং মুখটা হা হয়ে যায়। তখন তারা কী ভাবে জানার কোনো উপায় নেই কিন্তু সেটা যে ভালো কিছু না সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের বেলাতেও সেটা সত্যি, সবাই আমার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য খুব ব্যস্ত কিন্তু কেন জানি আমার সত্যিকারে প্রাণের বন্ধু বলে কেউ নেই।

আমি জানালার কাছাকাছি একটা ডেস্কে আমার ব্যাকপেকটা রাখতেই কয়েকজন আমার কাছে এগিয়ে এলো, সাদিব নামের চালুবাজ ধরনের একজন কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কাজল, কাল রাতে এম টিভি দেখেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না। দেখি নাই। কেন?"

"এমিনেমের একটা কনসার্ট ছিল—ওহ্ দোসত একেবারে ফাটাফাটি কনসার্ট!" সাদিব এমিনেমের অনুকরণ করে দুই হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে র‍্যাপারদের মতো চেচাতে শুরু করল। নাসিয়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "সাদিব তুই এক নম্বরের জোকার। বড় হলে তুই জিম ক্যারি হবি!"

জিন্নাত ঠোঁট উল্টে বলল, "তোরা যে কীভাবে র‍্যাপারদের সহ্য করিস! এমিনেম একটা শোনার জিনিস হল?"

সাদিব মুখ শক্ত করে বলল, "কেন কী হয়েছে? তোর ভালো না লাগলে তুই শুনিস না। আমরা শুনলে তোর এতো মাথাব্যথা কেন?"

"তুই তো খালি শুনছিস না—আমাদেরকে জোর করে শুনাচ্ছিসও! একটা বাজে জিনিস শুনতে কারো ভালো লাগে?"

সাদিব গর্জন করে বলল, "বাজে জিনিস? এমিনেম বাজে জিনিস? তোর বি. এস. বি. পারবে এমিনেমের মতো? নিক পারবে? কেভিন পারবে?"

জিন্নাত মুখ ভেংচে বলল, "পারতে হবে কেন? চেষ্টা করলে একশবার পারবে কিন্তু তারা কোনদিন চেষ্টা করবে না। ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ তো আর পাগল–ছাগল না, তারা তো আর পাগলামি করে না।"

জিন্নাত আর সাদিব দুজনে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে ঝগড়াটা আরও ছড়িয়ে পড়ল, মেয়েরা বেশির ভাগ এলো জিন্নাতের দিকে ছেলেরা সাদিবের দিকে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যান্ডগুলো—তাদের গায়কগুলো! কপাল ভালো এর মাঝে একজন ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা শুরু করলো, ছেলেদের কয়েকজন তখন সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নতুন ফাস্টফুডের দোকান আর ভিডিও গেম নিয়েও হঠাৎ কয়েজন উত্তেজিত আলোচনা শুরু করে দেয়। ক্লাসের সবচেয়ে পাজী আর বখে যাওয়া ছেলেগুলো ক্লাসের এক কোনায় বসে নিজেদের মাঝে গুজগুজ–ফুসফুস করতে থাকে আর মাঝে মাঝে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ভঙ্গি করে হাসতে থাকে। নায়িকা টাইপের কয়েকজন মেয়ে ঘরের আরেক কোনায় বসে নিজেরা নিজেরা কিছু একটা বলে হি হি করে হেসে নিজেদের মাঝে গড়িয়ে পড়তে থাকে। এর মাঝে চশমা পরা দুই তিনজন ভালো ছাত্র একটা খাতা খুলে কঠিন একটা অংক নিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করতে থাকে! মানুষ যে অংক নিয়েও ঝগড়া করতে পারে সেটা কে জানত!

ক্লাসের ঘণ্টা শুরু হবার সাথে সাথে ক্লাসটা মোটামুটি শান্ত হয়ে আসে। প্রথম পিরিয়ডে ইংরেজি সাহিত্য, দ্বিতীয় পিরিয়ডে সোসাল স্টাডিজ, তৃতীয় পিরিয়ডে জ্যামিতি। প্রথম দুটি পিরিয়ড মোটামুটি নিরুপদ্রবে কাটলেও তৃতীয় পিরিয়ডে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। আমাদের স্কুলের এই নতুন বিল্ডিংটা তৈরি হবার পর স্কুলের বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই স্কুলে পড়ে শুধু বড়লোকের ছেলেমেয়েরা তাই বেতন বাড়লেও কারো কোন সমস্যা হয় না কিন্তু সবাই চায় স্কুলের পড়াশোনাটাও ভালোমতো হোক। ভালো পড়াশোনার জন্যে দরকার ভালো টিচার, সবার ধারণা সাদা চামড়া না হলে ভালো টিচার হয় না তাই আমাদের স্কুলে কয়েকজন বিদেশী টিচার আনা হয়েছে। তাদের একজন হচ্ছে রিচার্ড গার্ভিং—সে এসেছে ব্রিটেন থেকে, তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের ক্লাসে জ্যামিতি ত্রিকোণোমিতি এলজেবরা পড়ানোর। রিচার্ড গার্ভিং মানুষটা টিচার হিসেবে বেশ ভালোই কিন্তু ক্লাসে খুব উৎপাত করে, একটু পরপর কাউকে না কাউকে দাঁড়া করিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। এটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল সবাই মোটামুটি ইংরেজি জানে কিন্তু রিচার্ড গার্ভিংয়ের ইংরেজি বোঝা খুব কষ্ট। আজকেও জ্যামিতি ক্লাসে তার উৎপাত শুরু হয়ে গেল। প্রথমে নাফিসকে জিজ্ঞেস করল ইউক্লিডের এক্সিওম—সে পারল না, পারার কথাও না তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেও সে পারবে কী–না সন্দেহ। তারপর ওয়াসিমকে জিজ্ঞেস করল পিথাগোরাসের সূত্রের প্রমাণ—চট করে সেটা বলে দেয়া কী সোজা ব্যাপার? 'ক্লাস–আইনস্টাইন' শাফকাতেরও সেটা নিয়ে সমস্যা হয়। কাজেই ওয়াসিমও আচ্ছামতোন বকুনি খেলো। দেশী মানুষের বকুনি খেলে গায়ে লাগে না, কিন্তু বিদেশীর বকুনি খেলে খুব খারাপ লাগে বিশেষ করে সেই ব্যাটা যখন মাঝে মাঝে দেশ তুলে গালি দিয়ে দেয়। এরপর নিজাতকে জিজ্ঞেস করল বৃত্তের দুটি জ্যা–এর ছেদ বিন্দু নিয়ে একটা সূত্র—এটা নিজাতের

পারা উচিত ছিল, সে বেশ ভালো ছাত্রী কিন্তু আজ ক্লাসে বকাবকি দেখে সে নার্ভাস হয়ে ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করল (অল্পতেই কেঁদে দেয় বলে নিজাতকে অনেকে নেকু নিজাত ডাকে)। নিজাতকে কাঁদতে দেখে রিচার্ড গার্ভিং আরো রেগে গেল এবং চোখ পাকিয়ে সারা ক্লাসের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আমাকে দাঁড়াতে বলল। আমি এমনিতেই অংকে কাঁচা তার ওপর জ্যামিতি আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। কাজেই আমার মাথায় মোটামুটি আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু রিচার্ড গার্ভিং আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস জিজ্ঞেস করল, সে বলল, "ব্যাংলাদেশের মতো তুচ্ছ দেশের অপদার্থ মানুষের ফালতু ছেলেমেয়েরা—যারা পড়াশোনা করতে চায় না তাদের কী করা উচিত?"

আমি একটু ভ্যাবেচেকা খেয়ে বললাম, "তারা পড়াশুনা করতে চায়।"

"আমি তো দেখছি না। কেউ তো সেরকম প্রমাণ দেখায় নি।"

"একটু সময় দিতে হবে।"

"সময়?" রিচার্ড গার্ভিং গর্জন করে বলল, "কতো সময়? তিন মাস শেষ হয়ে চতুর্থ মাস শুরু হল এখনো ইউক্লিডের এক্সিওম জানে না—"

আমার কী হল জানি না বলে ফেললাম, "আপনিও তো এই দেশে এসেছেন ছয় মাস। এখনো দেশের নামটা শিখতে পারেন নি।"

রিচার্ড গার্ভিং চোখ লাল করে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ব্যাংলাদেশ না। কিন্তু আপনি তো ব্যাংলাদেশ বলেন।"

রিচার্ড গার্ভিংয়ের মুখ হা হয়ে গেল, সে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিক বলতে পারল না। আমি যখন শুরু করেই দিয়েছি মাঝখানে থেমে না থেকে আরো একটা ডোজ দিয়ে দিলাম, বললাম, "আমরা সবাই অপদার্থ মানুষের ফালতু ছেলেমেয়ে হতে পারি, কিন্তু আমাদের দেশ তুচ্ছ না। আমাদের দেশ নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলা আপনার ঠিক হয় নি।"

রিচার্ড গার্ভিংকে প্রথমবার কেমন যেন হতবুদ্ধি দেখাল। সে আমতা আমতা করে বলল, "আমি তোমাদের দেশ নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলি নি।"

আমি গলায় বেশ জোর দিয়ে বললাম,"বলেছেন।" এবং সাথে সাথে সারা ক্লাসে আমার সমর্থনে একটা গুঞ্জন উঠল।

রিচার্ড গার্ভিং ধমক দিয়ে বলল, "চুপ করো সবাই।"

সারা ক্লাস চুপ করে গেলো এবং রিচার্ড গার্ভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে পড়াতে শুরু করল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বসে পড়লাম।

দুপুর বেলা আমার প্রিন্সিপালের অফিসে ডাক পড়ল, গিয়ে দেখি সেখানে রিচার্ড গার্ভিং আগে থেকে বসে আছে। আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল একজন মোটাসোঁটা বয়স্ক মহিলা। চুল ছোট করে ছাটা এবং ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। কম বয়সী মেয়েরা ঠোঁটে লিপস্টিক দিলে দেখতে বেশ ভালো লাগে কিন্তু বয়স্কা মহিলারা এরকম লাল লিপস্টিক দিলে দেখে কেমন যেন ভয় লাগে। আমাদের প্রিন্সিপাল এত বদমেজাজি এবং কড়া মহিলা যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকাই রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। প্রিন্সিপাল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে ক্লাসে কী হয়েছিল?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "না–মানে ইয়ে—"

"ছেলে, তুমি কী ডিসিপ্লিন নামে একটা শব্দ শুনেছ?"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"এই স্কুলে শিক্ষকদের সাথে বেয়াদপি করা আমরা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করি।"

আমি শেষ চেষ্টা করে বললাম, "কিন্তু, মানে, স্যার—"

"একজন ত্যাগী শিক্ষককে পৃথিবীর অন্য পাশ থেকে এই দেশে এনে তাকে ক্লাসে অপমান করা—"

"আমি অপমান করতে চাই নি। যখন বাংলাদেশকে—"

"চুপ করো।" প্রিন্সিপাল প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "পলিটিশিয়ান হয়েছ? দেশপ্রেমিক হয়েছ? তোমাকে এই স্কুল থেকে বের করে দেয়া দরকার। তোমার মতো বখাটে বেয়াদব ছেলের কোন প্রয়োজন নেই।" প্রিন্সিপাল লাল চোখে আমার দিকে তাকালেন এবং আমি স্পষ্ট দেখলাম তার কপালের কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। আমি খুব অসহায়বোধ করতে থাকি—স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার মতো লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে? এর আগে স্কুল থেকে যাকে বের করে দেওয়া হয়েছে তার নাম জায়েদ, জায়েদের ব্যাকপেকে ফ্যান্সিডিলের বোতল পাওয়া গিয়েছিল।

প্রিন্সিপাল কোথায় যেন একটা বোতাম টিপলেন এবং তখন পাশের রুম থেকে প্যাড হাতে একটা কম বয়সী মেয়ে এলো। প্রিন্সিপাল তাকে বললেন, "এই ছেলের পার্টিকুলারস নিয়ে রাখো। মি. গার্ভিং এর বিরুদ্ধে সিরিয়াস কমপ্লেন করেছেন।" আমি আবার কথা বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু প্রিন্সিপাল আমাকে কোন পাত্তাই দিলেন না, কঠিন গলায় বললেন, "তোমার বাবার নাম কী?"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "আলতাফ নবী।"

সাথে সাথে মনে হল হঠাৎ করে ঘরে যেন কেউ একটা বোমা ফাটালো নিঃশব্দের বোমা। সারা ঘর মুহূর্তে নিঃশব্দ হয়ে গেল। মনে হল ঘরের মাঝে সবাই যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে কেউ চোখের পাতি ফেললেও যেন তার শব্দ শোনা যাবে। প্রিন্সিপালের মুখ হা হয়ে খুলে যায় এবং আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম তার দাঁতগুলো হলদে এবং জিবটা কালচে। প্রিন্সিপাল কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "আ–আ আলতাফ নবী? আলতাফ গার্মেন্টসের আলতাফ নবী?"

আমি মাথা নাড়লাম।

প্রিন্সিপালের মুখের মাঝে এক ধরনের ক্যামিকেল রিএকশান হতে থাকে এবং মুখের কঠিন ভাবটা খুব আস্তে আস্তে নরম হতে শুরু করে। দেখতে দেখতে মুখটা কেমন ত্যালত্যালে এবং হাসি হাসি হয়ে গেল। স্কুলের কোন ছেলেমেয়ে এই প্রিন্সিপালকে কখনো হাসতে দেখে নি এবং আমি সম্ভবত সবার প্রথম এই দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করছি। এই প্রিন্সিপালের চেহারা এরকম যে দেখলেই ভয় করে এবং যখন তিনি হাসি হাসি মুখ করলেন সেটা দেখে আমার আরো বেশি ভয় করতে লাগল। প্রিন্সিপাল তার গলা থেকে মধুর একটা শব্দ বের করে বললেন, "বাবা তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।"

আমার বসার সাহস হল না, মাথা নেড়ে বললাম, "বসতে হবে না ম্যাডাম।"

"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

"ভালো।"

প্রিন্সিপাল তার ত্যালত্যালে মুখটাকে আরো ত্যালত্যালে করে বললেন, "তোমার বাবা যে কী চমৎকার একজন মানুষ। আমাদের স্কুলকে খুব সাহায্য করেছেন। বিগ ডোনেশান দিয়েছেন। ভেরি বিগ ডোনেশন।"

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রিন্সিপাল এবারে রিচার্ড গার্ভিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "আমার স্কুলের ছেলেরা কতো তেজস্বী দেখেছেন?"

রিচার্ড গার্ভিং পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারছিল না, যাকে বেয়াদবি করার জন্যে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছিল, হঠাৎ করে সে কেমন করে তেজস্বী হয়ে গেল বোঝা খুব সহজ নয়। প্রিন্সিপাল হাত নেড়ে বললেন, "আমার ছেলেরা দেশপ্রেমিক। দেশকে নিয়ে একটু উনিশবিশ কথা বললে তারা প্রতিবাদ করে। তাদের দেখে গর্বে আমার বুক দশ হাত ফুলে যায়।"

কমবয়সী সেক্রেটারি মেয়েটি প্রিন্সিপালের কথার সাথে সাথে পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগলো। প্রিন্সিপাল মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে বললেন, "বুঝলেন মি. গার্ভিং, ক্লাস নেয়ার সময় খুব সাবধান থাকবেন। ভুলেও যেন দেশের প্রতি অসম্মান দেখানো না হয়। বাঙালি জাতি অত্যন্ত গর্বিত জাতি।" প্রিন্সিপাল আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "তাই না?"

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে বললাম, "আমি তাহলে যাই?"

"হ্যাঁ, বাবা যাও। যাও।" প্রিন্সিপাল মাথা নেড়ে বললেন, "তোমার যে-কোন সমস্যা হলেই আমার কাছে চলে আসবে। যে-কোন সময়। সংকোচ করবে না। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আর তোমার বাবাকে স্কুলের পক্ষ থেকে গ্রিটিংস।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম তারপর ভয়ে ভয়ে প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে প্রায় সবাই ভয় পাওয়া মুখে অপেক্ষা করছিল, আমাকে দেখে ছুটে এলো, "কী হয়েছে?"

কেন জানি না আসল ব্যাপারটা বলতে আমার লজ্জা করল, আমি না বোঝার ভান করে বললাম, "কীসের কী হয়েছে?"

"তোকে যে ডেকে পাঠাল?"

'ও!" আমি হাত দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার ভান করে বললাম, "প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার আব্বুকে একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে চাইছিলেন তাই টেলিফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করলেন।'

নাফিস বলল, "তাও ভালো! আমি আরও ভাবলাম—"

"কী?"

নাফিস হাত দিয়ে গলায় পোচ দেয়ার ভঙ্গি করল, আমি জোর করে হেসে বললাম, "ধুর গাধা!"

দুপুর বেলা যখন গাড়ি করে বাসায় ফিরে আসছি তখন ড্রাইভার চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সেই চেঁচামেচির সিডিটা লাগাব?"

"লিংকিন পার্ক?"

"নাম তো জানি না। যেটা আপনি শুনেন।"

"নাহ্ থাক। শোনার ইচ্ছে করছে না।"

ড্রাইভার চাচা একটু অবাক হলেন বলে মনে হল। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আচ্ছা ড্রাইভার চাচা, আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

"কী জিনিস?"

"বেশি টাকা হওয়া কী ভালো না খারাপ?"

ড্রাইভার চাচা শব্দ করে হেসে বললেন, "কতো বেশি?"

"আব্বুর মতো বেশি।"

"সেটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। কারো জন্যে ভালো হতে পারে আবার কারো জন্যে সেটা খারাপ হতে পারে।"

ড্রাইভার চাচা রিয়ারভিউ মিররে পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেমন মনে করেন যে আপনার জন্যে সেটা ভালো হয়েছে। আপনি ভালো স্কুলে পড়তে পারেন। ভালো সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, ভালো পরিবেশ—"

আমি ড্রাইভার চাচাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে বললাম, "আব্বুর জন্যে সেটা ভালো হয়েছে না খরাপ হয়েছে?"

ড্রাইভার চাচা খুব চিন্তিত মুখে বললেন, "বড় সাহেবের জন্যে? ব্যাপারটা আসলে খুব জটিল। বুঝলেন ছোট সাহেব আপনার প্রশ্নটা খুব কঠিন।"

আমি বুঝতে পারলাম ড্রাইভার চাচার ধারণা আব্বুর জন্যে ব্যাপারটা খুব খারাপ কিন্তু সেটা তিনি সোজাসুজি বলতে পারছেন না। বলার সাহস পাচ্ছেন না।

ভোরবেলা আম্মুকে দেখে আমি চমকে উঠলাম—মাথার চুল এলোমেলো, চোখ দুটো লাল এবং চোখের নিচে কালি। আম্মুর গায়ের রঙ খুব ফরসা, আজ ভোরে সেখানে লালচে এক ধরনের আভা। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু তোমার কী হয়েছে?"

আম্মু খুব শান্ত এক ধরনের শীতল গলায় বললেন, "কিছু হয় নাই।"

আম্মুর গলা শুনে আমি দ্বিতীয়বার চমকে উঠলাম, এরকম গলায় তাকে আমি কোনদিন কথা বলতে শুনি নি। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে আর সেটা আমাকে বলতে চাইছেন না। আম্মুর সাথে আমার খুব সহজ সম্পর্ক, একেবারে অর্থহীন ব্যাপার নিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি গলার রগ ফুলিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করতে পারি। কিন্তু আজকে আম্মুর চোখের দিকে তাকিয়ে আর গলার স্বর শুনে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, আমি কোন কথা বলারই সাহস পেলাম না।

নাস্তার টেবিলে বসে কোন কথা না বলে আমি এক স্লাইস-টোস্ট এমন কী একটা ডিমের অমলেট খেয়ে ফেললাম, আম্মু একবারও আমার দিকে ঘুরে তাকালেন না। তার খেলনার মতো টি-পট থেকে নীল রংয়ের কাপে চা ঢাললেন কিন্তু সেখানে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, পাথরের মূর্তির মতো একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। আব্বু নেই, হয় অনেক সকালে নাস্তা করে চলে গেছেন না হয় এখনো ঘুমিয়ে আছেন।

আমি নাস্তা শেষ করে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে রেডি হয়ে ভয়ে ভয়ে আম্মুকে ডাকলাম, "আম্মু।"

আম্মু আমার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। আমি আবার ডাকলাম, "আম্মু।"

আম্মু আমার দিকে ঘুরে না তাকিয়েই বললেন, "কী?"

"স্কুলে যাচ্ছি।"

"যা।" বলে আম্মু আগের মতোই যেদিকে তাকিয়েছিলেন সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার এতো মন খারাপ হল যে বলার মতো নয়। মন খারাপের সাথে সাথে আমার এক ধরনের ভয় লাগতে থাকে। কী নিয়ে ভয় বুঝতে পারছি না বলে ভয়টা আমার সারা শরীরকে প্রায় অবশ করে ফেলতে থাকে।

গাড়িতে উঠেই আমি ড্রাইভার চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ড্রাইভার চাচা—"

"বলেন ছোট সাহেব।"

"আম্মুর কী হয়েছে আপনি জানেন?"

"বেগম সাহেবের?" ড্রাইভার চাচা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, "না ছোট সাহেব জানি না।" ড্রাইভার চাচা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? কী হয়েছে?"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "আপনি জানেন কী হয়েছে। আপনি আমাকে বলবেন না।"

ড্রাইভার চাচা রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে আমার দিকে কেমন যেন অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আপনার জানার মতো কিছু হলে আপনি তো জানবেনই।"

"শুধু একটা জিনিস বলেন ড্রাইভার চাচা—"

"কী জিনিস?"

"সিরিয়াস কিছু কী হয়েছে?"

ড্রাইভার চাচা ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মতো ভান করে বললেন,"কোনটা সিরিয়াস কোনটা সিরিয়াস না সেটা আপনি কেমন করে বলবেন? কেউ কেউ একটা খুব ছোট জিনিসকে মনে করে সিরিয়াস আবার কেউ কেউ খুব সিরিয়াস জিনিসকে মনে করে খুব ছোট জিনিস—"

ড্রাইভার চাচার সাথে কথা বলার এটাই হচ্ছে মুস্কিল, যে কোন কথাকে প্যাঁচিয়ে এমন করে ফেলবেন যে সেটা থেকে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাড়ির ড্রাইভার না হয়ে রাজনীতি করলে মনে হয় এতোদিনে সাংসদ না হয় মন্ত্রী হয়ে যেতেন!

স্কুলে সারাটা দিন আমার খুব দুশ্চিন্তার মাঝে কাটলো। সারাক্ষণই বুকের মাঝে এক ধরনের চাপা ভয়। স্কুলে বন্ধু-বান্ধবেরা যখন হৈচৈ করছে তখন মাঝে মাঝে আমিও যোগ দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গেছি কিন্তু আবার হঠাৎ করে আম্মুর কথা মনে পড়ে গেছে সাথে সাথে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

বাসায় ফিরে আসার সময় আমি চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলাম। শওকত লিপ্স বিজকিটের একটা সিডি দিয়েছে সেটা শোনার ইচ্ছে পর্যন্ত করল না। অর্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পর আমি ড্রাইভার চাচাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ড্রাইভার চাচা।"

"জী!"

"বাসার অবস্থা কী?"

"আমি তো ভেতরে যাই নাই ছোট সাহেব।"

"আম্মু কী বাসাতেই আছেন?"

"জী। বাসাতেই আছেন।"

"আব্বু?"

"বড় সাহেব তো আফিসে।"

আমি আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

আমার সন্দেহ ছিল যে বাসায় এসে দেখব আম্মু নাস্তার টেবিলে সামনে নীল রংয়ের কাপটা নিয়ে এখনো ঠিক একভাবে বসে আছেন। কিন্তু এসে দেখলাম অন্তত সেটি সত্যি নয়। আম্মু গোসল করে মেরুন রংয়ের একটা শাড়ি পরেছেন। আম্মুর চেহারা খুব ভালো, একটু সাজগোছ করলে একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখায় কিন্তু আম্মু কখনোই সাজেন না। আজকেও সাজেন নি, কিন্তু তবু কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে। তবে তার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দিশেহারা ভাব। আমাকে দেখে মনে হল খুব কষ্ট করে একটু হাসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু—"

আম্মু কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কী হয়েছে আম্মু?"

"কিছু হয় নি।"

"নিশ্চয়ই হয়েছে তুমি এরকম চুপচাপ বসে আছ কেন? বল কী হয়েছে!"

"আমি— আমি—" আম্মু একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি একটা জিনিস ভাবছি।"

"কী ভাবছ আম্মু?"

আম্মু কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আমাকে কাছে টেনে এনে নরম গলায় বললেন, "সোনামণি আমার। আমাকে একটু একলা বসে ভাবতে দে।"

আম্মু প্রায় সব সময়েই আমাকে বকাবকি করছেন, কান টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন, মাথা ভেঙ্গে ফেলবেন এগুলো হচ্ছে তার প্রিয় কথা। ছোট থাকতে সোনামণি বলে ডেকেছেন কিন্তু বড় হওয়ার পর এরকম আদর করে নরম গলায় সোনামণি বলে ডেকেছেন মনে পড়ে না। তার এই নরম গলায় কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা যেন গুঁড়িয়ে গেল। ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে সেটা নিয়ে আমার ভেতরে কোন সন্দেহ রইল না। সেটা কী জানা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

কী করব বুঝতে না পেরে আমি একা একা খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। নতুন কম্পিউটার গেমটা দিয়ে দু-এক মিনিট খেলেই আর খেলার ইচ্ছে করল না। ফাটাফাটি একটা সায়েন্স ফিকশান পড়ার জন্যে অনেক দিন থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি কয়েক পৃষ্ঠা পড়ায় সেটাও কেমন যেন পানসে লাগতে লাগল। খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম তখন আরো বেশি মন খরাপ লাগতে লাগল। ডিভিডিতে ম্যাট্রিক্স সিনেমাটা অনেকবার দেখেছি, আরও একবার দেখব কী না চিন্তা করেও শেষ পর্যন্ত আর ইচ্ছে করল না। বিছানায় খানিকক্ষণ ছটফট করে একসময় উঠে বসলাম। ঘরের মাঝে জামা কাপড়,

বইপত্র, ব্যাট বল, সিডি, ম্যাগাজিন, জুতো স্যান্ডেল ছড়িয়ে–ছিটিয়ে একটা হতচ্ছাড়া ভাব হয়ে আছে। সবগুলো গুছিয়ে রাখতে শুরু করব কী না চিন্তা করলাম তাহলে আম্মু নিশ্চয়ই খুশি হবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ইচ্ছে করল না।

আমি তখন নিচে নেমে গেলাম, বাসার পেছনে অনেক খোলা জায়গা, গাছগাছালি দিয়ে ভরা। তার মাঝে খানিকটা জায়গা আলাদা করে সেখানে একটা বাগান করব বলে ঠিক করেছিলাম। বাসার মালীকে বলে দিয়েছিলাম জায়গাটা রেডি করতে। আমার কথাকে কেউ বেশি পাত্তা দেয় না বলে মালী জায়গাটাতে হাত দেয় নি। একদিক দিয়ে ভালোই হল এখন জায়গাটা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নেয়া যাবে। অশান্ত মনকে ব্যস্ত রাখার জন্যে এরকম একটা পরিশ্রমের কাজ করা মনে হয় খারাপ না।

আমি যখন জায়গাটা কোদাল দিয়ে কোপানো শুরু করেছি তখন সবাই হা হা করে ছুটে এলো—আমি সবাইকে বিদায় করে মাটি কোপানো শুরু করলাম। কাজটা খুব কঠিন, কিছুক্ষণেই আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেল—কিন্তু বিক্ষিপ্ত মনটাকে শেষ পর্যন্ত বেঁধে ফেলা গেছে।

সন্ধ্যের পর আমি পড়তে বসেছি তখন হঠাৎ মনে হল একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। এই বাসায় কোন ছোট বাচ্চা নেই বলে বহুদিন কেউ কাঁদে না। ছোটদের কান্নার মাঝে কোন শোক বা দুঃখ নেই কিন্তু বড় মানুষের কান্না অন্যরকম, তার মাঝে থাকে ভয়ংকর রকম দুঃখ। কান্নার শব্দ শুনে আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠি। কোথা থেকে শব্দটি আসছে আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। মনে হল লাইব্রেরি ঘর থেকে আসছে। কী করব বুঝতে পারলাম না তখন আম্মুর চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, মনে হল খুব কষ্ট পেয়ে কিছু বলছেন, কথা বলতে বলতে তার গলা ভেঙ্গে গেলো। তখন শুনতে পেলাম, আব্বু কিছু একটা বললেন, তার উত্তরে আম্মু যেন চাপা গলায় চিৎকার করে কিছু বললেন।

আমি কেন জানি আর বসে থাকতে পারলাম না। পড়ার টেবিল থেকে উঠে পায়ে পায়ে লাইব্রেরি ঘরে হাজির হলাম। দরজাটা ভেজানো ছিল হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। আম্মু আর আব্বু দুজনেই দাঁড়িয়ে আছেন, আম্মু জানালার কাছে, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন—আব্বু টেবিলের কাছে একটা চেয়ার ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে দুজনেই আমার দিকে তাকালেন, আম্মুর চোখ লাল এবং গাল চোখের পানিতে ভেজা। আব্বুর মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের চিহ্ন—আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, "কাজল? তুমি কেন এসেছ?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

আব্বু বললেন, "সেটা তোমার জানার দরকার নেই—"

আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আম্মু।"

আম্মু আমার দিকে তাকালেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বাইরে তাকালেন। আব্বু এবারে খানিকটা রেগে উঠে কঠিন গলায় বললেন, "কাজল, তুমি এখান থেকে যাও।"

আম্মু বাইরে তাকিয়ে থেকেই বললেন, "যাবে কেন? থাকুক।"

আব্বু ফ্যাকাসে মুখে বললেন, "থাকবে?"

"হ্যাঁ। থাকুক। ফাইনাল কথাগুলো ওর সামনেই হোক।"

আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম, ফাইনাল কথা? ফাইনাল কথা মানে কী? হঠাৎ করে ভয়ে আমার শিড়দাঁড়া দিয়ে কেমন যেন ঠাণ্ডা কিছু একটা বয়ে গেলো—বইয়ে পড়েছিলাম বেশি ভয় পেলে নাকী এরকম হয়, সত্যি সত্যি হয় কখনো চিন্তা করি নি।

আব্বু বললেন, "কিন্তু— কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কাজল ছোট মানুষ—"

আম্মু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "না। কাজল ছোট মানুষ না। আর যদি ছোট মানুষ হয়েই থাকে দশ মিনিটে সে বড় মানুষ হয়ে যাবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি।"

আমার মনে হতে লাগল, আমার চোখের সামনে হঠাৎ করে পরিচিত পৃথিবীটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে উড়ে যেতে শুরু করেছে। আম্মু কী বলবেন আমি জানি না, কিন্তু সেটা আমার আর শোনার সাহস নেই, আমার ইচ্ছে হল আমি দুই হাত কান চেপে ধরে ছুটে পালিয়ে যাই। আমি দরজার কাছে বসে পড়ে প্রচণ্ড এক ধরনের আতংক নিয়ে আম্মু আর আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আম্মু একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কাজল, বাবা শোন, তোর জানা, দরকার। আমি ঠিক করেছি তোর আব্বুকে আমি ছেড়ে চলে যাব।"

আমি চিৎকার করে উঠলাম, "কী বলছ আম্মু?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তোর আব্বুর সাথে বিয়ে হয়েছে বিশ বৎসর। বিশ বৎসরের বিয়ে কেউ এমনি এমনি ছুড়ে ফেলে দেয় না। কারণ আছে কাজল।"

আমার মনে হল আমি যেন ভালো করে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কোন মতে বললাম, "কী হয়েছে আম্মু?"

"স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের আসল ব্যাপরটি হল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যখন নষ্ট হয় তখন দুজন একসাথে থাকতে পারে না।" আম্মু বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর আব্বু আমার কাছে বিশ্বাস নষ্ট করেছে।"

আমি আব্বুর দিকে তাকালাম। আব্বুর মুখে কেমন যেন একধরনের দিশেহারা ভাব, কী হচ্ছে যেন বুঝতে পারছেন না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বললেন, "তুমি ব্যাপারটাকে বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছ শায়লা—"

আম্মু হঠাৎ করে ভয়ংকর খেপে গেলেন, হিংস্র গলায় চিৎকার করে বললেন, "আমি বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছি? বেশি সিরিয়াসলি? তোমার বিশ বৎসরের বিয়ে করা ওয়াইফ আছে—তেরো বছরের একটা ছেলে আছে, আর তুমি অন্য একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক করবে?"

"আহ্।" আব্বু হাত তুলে আম্মুকে থামানোর চেষ্টা করলেন, "কী বলছ তুমি কাজলের সামনে?"

আম্মু দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "তুমি ভাবছ কাজল এটা কোনদিন জানবে না?"

"আহ্ শায়লা! প্লিজ।" আব্বু কাতর গলায় বললেন, "প্লিজ।"

"ঠিক আছে।" আম্মু হঠাৎ করে নিজেকে শান্ত করে ফেললেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলের সামনে তোমার যদি লজ্জা লাগে তাহলে আমি আর কিছু বলব না।"

আব্বু বললেন, "দেখো শায়লা—"

"দেখার বিশেষ কিছু নেই। আমি ডিসিসান নিয়ে নিয়েছি।"

"নিয়ে নিয়েছ?"

"হ্যাঁ। আমি চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি জানি না। পৃথিবী অনেক বড় জায়গা সেখানে একজন মানুষের জায়গা হয়ে যাবে।"

আব্বু শুকনো মুখে বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না শায়লা।"

"তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি যদি বুঝতে পারতে তাহলে এটা হতো না।"

আব্বু খানিকক্ষণ আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলন। খুব ধীরে ধীরে তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল, মনে হল হঠাৎ করে যেন রেগে উঠছেন, অনেক কষ্টে নিজের রাগকে সামলে বললেন, "তুমি এখন কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? কী করবে?"

"সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।"

"ঘামাতে হবে। তুমি আমার ওয়াইফ।"

আম্মু মাথা নাড়লেন, বললেন, "না।"

"তার মানে?" আব্বু হঠাৎ করে যেন অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকালেন, "তুমি কী ডিভোর্সের কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি—তুমি—" আব্বু কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

"আমি কী?"

"তুমি যদি ডিভোর্স করো তাহলে—" আব্বু আবার থেমে গেলেন।

"তাহলে আমি তোমার সম্পত্তির কিছু পাব না—এটা বলতে চাইছ?"

আব্বু মাথা নাড়লেন।

আম্মু হাসার মতো ভঙ্গি করলেন, বললেন, "তুমি সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমি একটা মানুষকে ঘেন্না করবো কিন্তু তার টাকাকে ভালোবাসব সেটা হয় না। আমি তোমার টাকাকেও ঘেন্না করি।"

আব্বু কেমন যেন অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আম্মু বললেন, "গুডলাক আলতাফ। আমি যাচ্ছি।"

আব্বুর চেহারায় প্রথমবার এক ধরনের ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। কয়েকবার ইতস্তত করে বললেন, "আর কাজলের কী হবে?"

"কাজল!" আম্মুর যেন হঠাৎ করে আমার কথা মনে পড়ল, আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, তারপর বললেন, "আমাকে মাফ করে দিস বাবা। আমার কিছু করার নেই।"

এতক্ষণ আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ করে আমার দুই চোখ পানিতে ভরে গেল, আম্মু, আব্বু, লাইব্রেরি ঘর সবকিছু কেমন জানি ঝাপসা হয়ে গেল।

আব্বু বললেন, "কাজল তোমাকে ছাড়া কীভাবে থাকবে?"

"প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে।" আম্মু হাসার মতো ভঙ্গি করে বললেন, "মানুষ কী মারা যায় না? ধরে নাও আমি মরে গেছি।"

আম্মু তারপর দরজার দিকে হেঁটে আসতে শুরু করলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসে আব্বুর দিকে ঘুরে তাকালেন, তারপর বললেন, "গুডবাই আলতাফ।"

আম্মু আরো কয়েক পা এসে আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন তারপর ফিসফিস করে বললেন, "বাবা কাজল, মন খারাপ করিস না। দেখিস সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

আমার মনে হল জিজ্ঞেস করি, কেমন করে? কিন্তু গলা বুজে আছে বলে কিছু বলতে পরলাম না। আম্মু আমার মুখের কাছে মাথা এনে ফিসফিস করে বললেন, "একটা কথা মনে রাখিস কাজল। কখনো কারো বিশ্বাসের অমর্যাদা করবি না। কখনো করবি না। যতো বড় অন্যায় করতে হয় করে ফেলিস কিন্তু বিশ্বাসের যেন অমর্যাদা না হয়।"

আম্মু লাইব্রেরি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি আম্মুর পিছু পিছু এলাম, আম্মু তার ঘরে গিয়ে ছোট একটা ব্যাগ নিলেন, সেখানে দু-একটা কাপড় ভরলেন। ড্রেসিং টেবিল থেকে ছোট ছোট দুই-কটা কসমেটিক্স নিলেন। ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা নিলেন। বিছানার পাশে লাইট টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা বই নিলেন। আলমিরা খুলে একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিলেন। শেলফ থেকে এলবামটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে কয়েকটা ছবি নিলেন তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আরে গাধা ছেলে। তুই কাঁদছিস কেন? আমি কী মরে যাচ্ছি নাকী?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আম্মুকে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে বললাম, "প্লিজ আম্মু। প্লিজ—"

"ধুর বোকা ছেলে, কাঁদে না। তোর সাথে দেখা হবে না? দেখিস রোজই দেখা হবে। ঠিকভাবে স্কুলে যাবি, নিয়ম করে পড়াশোনা করবি।"

আমি আবার বললাম, "প্লিজ আম্মু। প্লিজ—"

"না বাবা। এভাবে হয় না? আমাকে যেতে দে—বেশি রাত হলে রিকশা স্কুটার পাব না।"

আমি অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকালাম। এই বাসায় সব মিলিয়ে চারটা গাড়ি—আম্মু তার একটাও নেবে না? রিকশা না হয় স্কুটারে করে যাবেন?

আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম, আম্মু আমাকে শেষবারের মতো বুকে জড়িয়ে আদর করে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নেমে গেলেন। আমার কাছে সারা পৃথিবীটা হঠাৎ করে শূন্য মনে হতে থাকে—আমার আম্মু একটা ছোট ব্যাগ হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন, আর কোন দিন ফিরে আসবেন না— ব্যাপারটি চিন্তা করে আমার বুক ভেঙ্গে গেল। আমি ডুকরে কেঁদে ছুটে আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ ঢেকে আছড়ে পড়লাম! হঠাৎ করে পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে।

আমি কয়েক মিনিট বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ করে আমি উঠে বসলাম। আমি কী আম্মুর সাথে চলে যেতে পারি না? আম্মু কোথায় থাকবেন জানি না কিন্তু আমিও কী তার সাথে থাকতে পারি না? আমি আমার ঘরের চারদিকে তাকালাম। বড় টেবিলের উপর

কম্পিউটর। টেবিলের উপর ছড়ানো ছিটানো বই, ঘরের কোনায় খেলার সরঞ্জাম, একপাশে সিডি প্লেয়ার, কাবার্ড বোঝাই জামা কাপড়, ঘরে এখানে সেখানে তেরো বছর ধরে জমানো নানা জিনিসপত্র। এর কোনটা রেখে আমি কোনটা নেব? আমি ব্যাকপেকটা টেনে কাবার্ড খুলে হাতের কাছে যে প্যান্ট আর টি-শার্ট পেলাম সেগুলো ঢুকিয়ে ফেললাম। টেবিলের উপর থেকে প্রিয় কয়টা গানের আর কম্পিউটারের সিডি, ড্রয়ারের ভিতর থেকে ফটো এলবামটা নিয়ে নিলাম। বিছানার নিচে থেকে জুতো জোড়া বের করে পরে নিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে গেলাম। সিঁড়ির উপরে আব্বু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকালেন। আমি আব্বুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আব্বু আমিও যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"আম্মুর সাথে।"

আব্বুর মুখ দেখে মনে হল যে আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এখন আর সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় নেই আমি সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে লাগলাম। আব্বু কয়েক মুহূর্ত কী করবেন বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর চিৎকার করে ডাকলেন, "কাজল, কাজল, শোন।"

কিন্তু এখন আর শোনার সময় নেই, আম্মুকে যদি খুঁজে না পাই একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি ছুটে বাইরের দরজা খুলে বের হয়ে এলাম, ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে আসতে আসতে দারোয়ানকে ইঙ্গিত করলাম গেট খুলে দিতে, সে গেট খুলে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু কোন দিকে গেছেন?"

দারোয়ান ডান দিকে হাত দিয়ে দেখালো। আমি যখন ছুটতে শুরু করেছি তখন মনে হল গেটের কাছে আব্বু, সিদ্দিক ভাই এবং অন্যেরাও এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের এই এলাকাটা বড় লোকদের এলাকা। শুধু বড় লোক নয় বাড়াবাড়ি বড় লোকদের এলাকা। তাই এই এলাকায় রিকশা-স্কুটার পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তায় গেলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। বড়লোকদের এলাকা বলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষ বলতে গেলে নেই—আমি তার ভেতরে আম্মুকে খুঁজতে থাকি। মনে হল বেশ দূরে একজনকে দেখা যাচ্ছে—এতো দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু মনে হল আম্মু হতেও পারে। কাছে গিয়ে দেখি সেটি অন্য মানুষ, আমি আবার ছুটতে লাগলাম। বড় রাস্তায় এসে দু'পাশে তাকালাম কোথাও আম্মু নেই। হঠাৎ করে এক গভীর আশাভঙ্গে আমার বুক ভেঙ্গে গেল। আমি আবার রাস্তার দুই পাশে তাকালাম, বেশ কিছু গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার মাঝে একটি দুটি রিকশা। এর কোন একটিতে কী আম্মু আছেন? আমি কি ছুটে দেখব? কোন দিকে ছুটে যাব? ডানদিকে না বাম দিকে? ছুটে না গিয়ে চিৎকার করে কি আম্মুকে ডাকব?

কিছু বোঝার আগেই আমি আবিষ্কার করলাম আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি, "আম্মু! আম্মু!"

রিকশাগুলোতে আম্মু থাকলে এখন নিশ্চয়ই আম্মু রিকশা থামাবেন— কিন্তু কোন রিকশা থামল না। তার অর্থ, আম্মু চলে গেছেন। আমি আবার চিৎকার করে ডাকলাম, আমার গলা শুনে গাড়ি থেকে মানুষজন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল কিন্তু আম্মুকে আমি খুঁজে পেলাম না।

আমার বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে। এখন আমি কী করব? আমি কি চিৎকার করে কাঁদব?

ঠিক তখন কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখল, আমি চমকে পেছনে তাকালাম, আম্মু দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী হল? এরকম ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছিস কেন?"

"আম্মু! তুমি?" আমি আনন্দে চিৎকার করে বললাম, "আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ!"

"চলে যাওয়া কী এতো সোজা? খালি রিকশা আছে নাকী এদেশে।" আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তুই কী করছিস এখানে"

"আমিও তোমার সাথে যাব।"

আম্মু ভুরু কুচকে বললেন, "আমার সাথে যাবি"

"হ্যাঁ।"

"তোর মাথা খারাপ হয়েছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি কোথায় থাকব আমি নিজেই সেটা এখনো জানি না।"

আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "সেটা তোমার মাথাব্যথা। তুমি যেখানে থাকবে আমি সেখানে থাকব—আমাকে তুমি ফেলে দিতে পারবে না।"

আম্মু বললেন, "কী মুস্কিল!" কিন্তু তার মুখে মুস্কিলের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, বরং মুখটা কেমন যেন খুশি খুশি হয়ে ওঠল, তবুও যেটুক সম্ভব বিরক্তির ভান করে বললেন, "তোকে নিয়ে যে কী মুশকিল। স্বাধীনভাবে একটা কাজ করতে পারি না।"

"জন্ম দেয়ার সময় মনে ছিল না?"

আম্মু খপ করে আমার কান ধরে বললেন, "বেয়াদবের মতো কথা বলবি তো কান ছিঁড়ে ফেলব।"

আরো কিছু ভালো ভালো ডায়ালগ ছিল কিন্তু কান বাঁচানোর জন্যে এখন সেগুলো আর বলা গেল না।

গাড়ি থেকে আগে যখন আমি রিকশা দেখেছি তখন সবসময় মনে হয়েছে এই জিনিসটা একটা আপদ, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে একটা গাড়ির সামনে চলে আসে—ধুকুপুকু করে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, যে মানুষ রিকশায় বসে মনে হয় সে বুঝি তার জানটা হাতে নিয়ে বসে। কিন্তু আজকে আম্মার সাথে রিকশায় বসে আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমত রিকশাটা বেশ উঁচু, বসে বসে চারদিকে দেখা যায়, রিকশা যায় খুব চমৎকার একটা গতিতে গাড়ির মতো হুস-হাস করে নয় ধীরে ধীরে, রাস্তার পাশে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার একটা সময় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা রিকশায় বসতে খুব আরাম, সিটটা না নরম না শক্ত, হেলান দিয়ে বসলে নিজেকে কেমন জানি রাজা রাজা মনে হয়। একমাত্র খারাপ জিনিস হচ্ছে রিকশাওয়ালাকে দেখা—রিকশাটা টেনে নিতে মানুষটার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু করার কথা নেই।

আম্মু রিকশায় বসে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কোথায় যাব এখনো ঠিক করতে পারছি না। কিছু ঠিক করতে না পারলে হোটেলে চলে যাব, কী বলিস?"

"হোটেলে?" আমি ইতস্তত করে বললাম, "হোটেলে থাকতে টাকা লাগবে না? তোমার কাছে টাকা আছে?"

"তুই কী ভেবেছিস আমার কোন পয়সাকড়ি নেই? এক দুই রাত হোটেলে থাকার মতো টাকা ঠিকই আছে।"

এই দুই রাত হোটেলে থাকার মতো টাকা শেষ হবার পর কী করবেন সেটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঠিক সাহস হল না। আম্মু বললেন, "তোর নানাবাড়ি যেতে পারি। কিন্তু যখন শুনবে সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি তখন তোর নানু হার্টফেল করতে পারে। কাজেই সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।"

"তাহলে কোথায় যাবে?"

"তোর আকরাম মামার বাসায়ও যেতে পারি। মনে আছে আকরাম মামার কথা?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"বিপদের সময় সাহায্য করেছিলাম তো, সে জন্যে মানুষটা একেবারে পাগল হয়ে আছে কিছু একটা করার জন্যে। বউটাও খুব ভালো। প্রথম কয়েক দিন সেখানে থাকা যাবে।"

আমি কিছু বললাম না, আম্মু একটু পরে নিজেই বললেন, "কিন্তু সেখানে যাওয়া মনে হয় ঠিক হবে না।"

"কেন আম্মু?"

"কারণ মানুষটা বুঝতে পারবে না কেন আমি সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি। আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে আমি যেন ফিরে যাই।"

আমি এবারেও কিছু বললাম না। আম্মু বললেন, "শাহানার কাছে যেতে পারি। সে আবার উল্টো কেস। পারলে আজ রাতেই একটা ডাণ্ডা নিয়ে বের হয়ে যাবে তোর আব্বুর মাথায় একটা বাড়ি দেয়ার জন্যে।"

কথাটা বলে আম্মু একটু হাসলেন আমি অবশ্যি এর মাঝে হাসার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। আম্মু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সবচেয়ে ভালো হয় মাধুরীর বাসায় গেলে। আমরা একসাথে ইউনিভার্সিটিতে গেছি। মাধুরী পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আমার প্রাণের বন্ধু।"

"তোমার প্রাণের বন্ধু তাহলে তোমার সাথে কোন যোগাযোগ নাই কেন?"

"প্রাণের বন্ধু হলেই যোগাযোগ থাকতে হবে কে বলেছে?" বেশিরভাগ সময়েই আম্মার কথায় যুক্তি থাকে না তাই আমি এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। আম্মু বললেন, "মাধুরী হচ্ছে মিডল ক্লাস ফ্যামেলি। আমরা ছিলাম বাড়াবাড়ি বড়লোক। বাড়াবাড়ি বড়লোক আর মিডল ক্লাস ভালো যোগাযোগ রাখতে পারে না। সমস্যা হয়।"

আমি কিছু না বুঝেই বললাম, "ও।"

"দেখিস আমাকে দেখে কী খুশি হবে।"

সত্যি সত্যি আম্মুর প্রাণের বন্ধু মাধুরী খালা আম্মুকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন। আম্মুকে জড়িয়ে ধরে ছোট বাচ্চাদের মতো লাফালাফি করতে লাগলেন। আম্মু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "মাধুরী কয়দিন তোর বাসায় থাকতে এসেছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সব কিছু ছেড়েছুড়ে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি।" এক মুহূর্তের জন্যে মাধুরী খালার চোখে বিস্ময় উঁকি দিয়ে গেল কিন্তু মাধুরী খালা সেটা সাথে সাথে গোপন করে ফেললেন, "বেশ করেছিস।"

আম্মু বললেন, "কেন ছেড়ে এসেছি জিজ্ঞেস করবি না?"

"নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। বলবিখন ধীরে সুস্থে—এত তাড়াহুড়া কিসের? আয় হাত-মুখ ধুয়ে একটু আরাম কর। কতদিন পর তোর সাথে দেখা।" মাধুরী খালা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওমা কাজল দেখি কতো বড় হয়েছে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। মাধুরী খালা আমার হাত ধরে ভেতরে টেনে আনলেন এবং কোথায় থাকব কোথায় ঘুমাব সেটা নিয়ে সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মাধুরী খালা আসলেই খুব বুদ্ধিমান মানুষ। আম্মু এভাবে সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছেন সেটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আম্মু বাইরে দিয়ে যতই শান্ত থাকার ভান করুক ভেতরে খুব অশান্তিতে ছটফট করছেন—কাজেই আম্মুর দরকার একটা নিরিবিলি ঘর যেখানে আম্মু একা একা বসে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে পারবেন। মাধুরী খালা সে জন্যে প্রথমেই আম্মুর জন্যে আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। বাসা ছোট, বাড়তি কোন ঘর নেই সেই জন্যে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হল বসার ঘরের মেঝেতে—আম্মু বললেন, তার প্রয়োজন হবে না আমি তার সাথেই ঘুমুতে পারব। আমি শেষবার কবে আম্মুর সাথে ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই—এতো বড় একজন মানুষ মায়ের সাথে ঘুমাবে চিন্তা করে আমার রীতিমতো লজ্জা লাগতে লাগল।

একটু সময় পরেই বাসায় আমার নিজের ঘরটার জন্যে আমার মনটা আকুপাকু করতে থাকে। আমার বড় বিছানা, মাথার কাছে ডেস্কের ওপর ছড়ানো ছিটানো বই, টেবিলের ওপর আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেটের কালেকশান, সিডি প্লেয়ারে গান, শেলফে রাজ্যের যতো সায়েন্সফিকশন আর রহস্য উপন্যাস—মনে হতে লাগল এর যে কোন একটার জন্যে আমি এখন আমার জীবন দিয়ে দিতে পারব।

কিছুক্ষণের মাঝেই আমার কৌশিকের সাথে পরিচয় হল, মাধুরী খালাদের একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে। মেয়েটা ছোট, হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে ছেলেটার বয়স পাঁচ কিংবা ছয়, নাম কৌশিক, খুব পাকা পাকা কথা বলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কয়দিন থাকবে?"

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন, আমি মাথা চুলকে বললাম, "এই তিন চার দিন।"

কৌশিক মুখ সুঁচালো করে বলল, "হ্যাঁ। বেশিদিন থেকো না। ঠিক আছে?"

"কেন? বেশিদিন থাকলে কী হবে?"

সে আমাদের দেয়া ঘরটি দেখিয়ে বলল, "এইটা তো আমার ঘর, তুমি থাকলে তো আমি আমার ঘরে আসতে পারব না।"

আমি বললাম, "কেন আসতে পারবে না?"

কৌশিক দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, "আমার আম্মু না করেছে। বলেছে ডিস্টার্ব করবি না।"

আমি ষড়যন্ত্রীর মতো মুখ করে বললাম, "কিছু ডিস্টার্ব হবে না। তোমার যখন ইচ্ছা চলে এসো।"

"আসব?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি আমার সাথে খেলবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "খেলব।"

"তুমি ফাইটিং ফাইটিং খেলতে পার?"

ফাইটিং ফাইটিং খেলাটি কীভাবে খেলতে হয় জানি না কিন্তু আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি ফাইটিং ফাইটিং খেলার এক্সপার্ট।"

কৌশিকের মুখে হাসি ফুটে উঠল, "তুমি টুটুল থেকেও বেশি এক্সপার্ট?"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "একশগুণ বেশি এক্সপার্ট।"

"রুনু থেকেও বেশি এক্সপার্ট।"

"রুনু থেকেও।"

কৌশিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রুনুর সাথে আমার জন্মের আড়ি হয়ে গেছে।"

"জন্মের আড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমাকে খামচি দিয়েছে।" কৌশিক খামচির চিহ্নটি খোঁজার চেষ্টা করে খুঁজে পেল না, শেষে একটা মশার কামড়ের দাগ দেখিয়ে বলল, "এই যে।"

আমাকে অনেক কষ্ট করে হাসি গোপন করতে হল, ছোট বাচ্চারা এরকম মজার হয় কে জানতো! আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, "রুনু তোমাকে খামচি দিয়েছে, তুমি তাকে কী দিয়েছ?"

কৌশিক এদিক সেদিক তাকিয়ে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "আমিও দিয়েছি। খামচি আর ঘুষি।"

আমি বললাম, "ভেরি গুড।"

"জন্মের আড়ি হলে আর কথা বলা যায় না। জন্মেও কথা বলা যায় না।" কৌশিক মুখ কালো করে মাথা নাড়ল। রুনু মানুষটি কে আমি জানি না কিন্তু তার সাথে আড়ি দিয়ে কৌশিক মানুষটি যে আনন্দে নেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন করে জন্মের আড়ি দিতে হয়?" কৌশিক তার কেনে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "এইটা জন্মের আড়ি।" তারপর তর্জনিটা দেখিয়ে বলল, "আর এইটা হচ্ছে ভাব।"

আমার মতোন একজন ভালো ছাত্র পেয়ে কৌশিক সাথে সাথে এই জটিল বিষয়টা ব্যাখ্যা করার কাজে লেগে গেলো—আমি বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, কৌশিকের তুলনা আমার জীবনটা রীতিমতো পানসে ছিল, কারো সাথে ঝগড়া করে আড়ি দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না!

কৌশিকের আব্বু জয়ন্ত কাকু এলেন রাত নয়টার দিকে—আমাদের দেখে এতেটা অবাক হলেন যে বলার মতো নয়। আম্মু সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছেন শুনে এমন ভান করলেন যে ঝগড়াঝাঁটি করে ছেলেকে নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসাটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। জয়ন্ত কাকুর চেহারা খুব সুন্দর, একেবারে রাজপুত্রের মতো সবসময়ই

মুখের মাঝে একটু হাসি, দেখে মনে হয় কিছু একটা দেখে খুব মজা পাচ্ছেন! মানুষটা মনে হয় গম্ভীর হতেই জানেন না, শুধুমাত্র খাবার টেবিলে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে একটু গম্ভীর হয়ে আম্মুকে বললেন, "দেখো বৌদি, তোমাকে বলে রাখি। তোমার এবং দাদার মাঝে কী হয়েছে আমি জানি না। এটা কী ছোটখাটো একটা ঝগড়া না সিরিয়াস কিছু সেটাও জানি না। সিরিয়াস কিছু হলে দোষটা কী তোমার না কী দাদার সেটাও আমি জানি না। জানতে চাইও না।"

আম্মু বললেন, "তাহলে তুমি কী জানতে চাও?"

"কিছু জানতে চাই না। শুধু তোমাকে বলতে চাই তোমাদের দু'জনের মাঝে যাই ঘটে থাকুক আমরা তোমার পক্ষে।"

"আমার পক্ষে?"

"হ্যাঁ। তুমি পাগলামি করো আর উল্টোপাল্টা কাজ করো আর ভুল করো আর অন্যায় করো কিছুতে কিছু আসে যায় না। আমরা তোমার সাথে আছি।"

আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাসলেন, বললেন, "এই জন্যে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।"

মাধুরী খালা বললেন, "মনে আছে রে শায়লা ইউনিভার্সিটিতে তুই আর আমি কী প্রাণের বন্ধু ছিলাম?"

আম্মু মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, মনে আছে একবার দোতলার বারান্দা থেকে হাউজটিউটরের মাথার ওপরে পানি ঢেলে দিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ!" মাধুরী খালা হাসতে হাসতে বললেন, "লাবণীর রুম থেকে যে একবার চিনি চুরি করলাম মনে আছে?"

আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কী মজার একটা লাইফ ছিলো। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তোরা আমাদের বাসায় আসা ছেড়ে দিলি কেন?"

মাধুরী খালা বললেন, "তোরা এরকম গাছে মাছে বড়লোক হয়ে গেলি, কেমন করে আসি বল।"

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "বড় লোকের সাথে আসা যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

মাধুরী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, "আছে। সম্পর্ক আছে।"

"কী সম্পর্ক?"

"যেমন মনে কর যখন তোদের বাসায় বেড়াতে যাই, গেটের সামনে রিকশা থেকে কিংবা স্কুটার থেকে নামি তখন দারোয়ান এইরকম চোখ পাকিয়ে তাকায়—মনে করে গরিব আত্মীয়-স্বজন টাকা ধার চাইতে এসেছে। ভেতরে খবর দিতে চায় না, ধানাইপানাই করে।"

আম্মুর মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে বললেন, "আমাকে বলিস নি কেন?"

"তোকে কী বলব? দারোয়ান ধানাইপানাই করছে? ওকে রাখাই হয়েছে সেই জন্যে—ফালতু মানুষকে আটকানোর জন্যে। সে তার ডিউটি করছে। তোরা খবর পেলে তার চাকরি যাবে—তাতে লাভটা হবে কী?"

আম্মু কোন কথা না বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, আমি মাধুরী খালা আর জয়ন্ত কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম যে আসলেই এটা সত্যি। আমাদের বাসায় আম্মু–আব্বু কিংবা আমার সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের সবার গাড়ি আছে। যাদের গাড়ি নেই, তাদের আমাদের বাসায় কারো সাথে দেখা করতে আসলেই খুব কঠিন ব্যাপার! মাধুরী খালা আর জয়ন্ত কাকু এমন চমৎকার মানুষ আম্মুর এতো ভালো বন্ধু তবু কোন যোগাযোগ নেই, কারণ তাদের গাড়ি নেই। কী আশ্চর্য!

খাবার টেবিলে খেতে খেতে আম্মু বললেন, "জয়ন্তদা আর মাধুরী তোদের একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কী কাজ?"

"আমার আর কাজলের জন্যে একটা বাসা খুঁজে দিতে হবে।"

মাধুরী খালা বললেন, "এতো তাড়াহুড়ো কিসের?"

"আছে, তাড়াহুড়ো আছে।"

জয়ন্ত কাকু বললেন, "ঠিক আছে। খুঁজে দেব। কতো বড় বাসা?"

"ছোট।" আম্মু খুব শক্ত করে বললেন, "খুব ছোট এবং সস্তা।"

জয়ন্ত কাকু বললেন, "তুমি থাকতে পারবে বৌদি?"

"পারব।"

"কোন এলাকায় চাও? কাজলের স্কুলের কাছাকাছি।"

আম্মু কোন কথা না বলে একবার আমার দিকে তাকালেন তারপর হঠাৎ করে নিচের দিকে তাকালেন। জয়ন্ত কাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"কাজল এখন যে স্কুলে আছে আমি তার খরচ পোষাতে পারব না।"

আমি চমকে উঠলাম, কখনো চিন্তাও করি নি যে আম্মু এরকম একটা কথা বলবেন। একটা স্কুলের খরচ দিতে পারবেন না? আমি অবাক হয়ে আম্মুর মুখের দিকে তাকালাম, আম্মু বললেন, "আমি যখন ডিসিশান নিয়েছি তখন কাজল আমার সাথে থাকবে বুঝতে পারিনি। এই গাধাটা পিছু পিছু চলে এসেছে। এসে সব হিসাব গোলমাল করে দিয়েছে।"

জয়ন্ত কাকু হাসতে হাসতে বললেন, "যখন মায়ের ব্যাপার আসে তখন সব ছেলেই গাধা হয়। গাধা হয়ে হিসাব গোলমাল করে দেয়। তাই না কাজল?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলাম। জয়ন্ত কাকু হাত দিয়ে আমার মাথার চুল এলোমলো করে দিয়ে বললেন, "কাজলকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না বৌদি। দাদা নিশ্চয়ই ওর খরচ দেবেন।"

"নিশ্চয়ই দেবে।" আম্মু কঠিন মুখে বললেন, "কিন্তু কাজল যদি আমার সাথে থাকে তাহলে আমি আলতাফের কাছ থেকে একটা পয়সাও নেবো না।"

আম্মু যেন খুব মজার একটা কথা বলেছেন এরকম ভঙ্গি করে জয়ন্ত কাকু মুখ টিপে হেসে বললেন, "ঠিক আছে।"

"ঠাট্টা না, আমি সিরিয়াস।"

জয়ন্ত কাকু হাসতে হাসতে বললেন, " আমিও সিরিয়াস!"

"তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল—"

জয়ন্ত কাকু হাত তুলে বললেন, "বৌদি সিরিয়াস কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে। এখন এসব থাক। ধীরে ধীরে আলাপ করবো। বেচারা কাজলকে দেখো কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছে।"

আসলেই টাকা–পয়সা–খরচ–বাসা–ভাড়া–বেতন–স্কুল এসব শুনে আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগতে থাকে, তবু জোর করে মাথা নেড়ে বললাম, "না, না আমি ঘাবড়াইনি।"

"না ঘাবড়ালে ভালো, কিন্তু এখন থাক। একদিনেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেললে কেমন করে হবে? ধীরে–সুস্থে করি। রয়ে–সয়ে করি! কী বল কাজল?"

কৌশিক ঘুরঘুর করছিল। আমার হাত ধরে টেনে বলল, "কাজল ভাইয়া, দেখো।"

"কী দেখব?"

"রুনুকে। জানালা দিয়ে আমার দিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।"

মাধুরী খালা বললেন, "কৌশিক, ভাগ এখান থেকে। খেতে দে কাজলকে।"

আমি বললাম, "আমার খাওয়া হয়ে গেছে।" তাড়াতাড়ি করে মুখে শেষ খাবারটুকু গুঁজে উঠে পড়লাম। টেবিলে এইসব কঠিন আলোচনা শোনার থেকে কৌশিকের সাথে রুনুর মুখ ভ্যাংচানো দেখা অনেক বেশি আনন্দের ব্যাপার। পাশের বাসার জানালা দিয়ে যে আরেকজনকে মুখ ভ্যাংচানো যায় সেটাই কী আমি কখনো জানতাম?

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে আম্মু বললেন, "বুঝলি কাজল, আজ থেকে আমাদের একটা নতুন জীবন শুরু হল।"

আমি অপরিচিত একটা জায়গায় শুয়ে আছি। আগের পরিচিত জায়গায় কখনো ফিরে যাব না, ব্যাপারটা গ্রহণ করতেই আমার সমস্যা হচ্ছে। আম্মু বললেন, "তুই এভাবে আমার সাথে চলে আসবি, বুঝতে পারিনি।"

"বুঝতে পারলে কী করতে আম্মু?"

"বুঝতে পারলেও এটাই করতাম। তোর আব্বু যেটা করেছে সেটা হচ্ছে একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া। এতো কষ্ট পাবার পর আর থাকা যায় না।"

"এখন আমরা কী করব আম্মু?"

"নতুন একটা লাইফ শুরু করব। সেটা হবে অন্যরকম লাইফ।"

"মাধুরী খালা আর জয়ন্ত কাকু আর কৌশিকের মতো?"

"অনেকটা। কিন্তু তারা তো লাকি, তাদের পুরো ফ্যামিলি আছে। আমাদের তো পুরো ফ্যামেলি থাববে না। ভাঙ্গা ফ্যামেলি। তুই আর আমি।"

"আব্বু এখন কী করবেন, আম্মু?"

আম্মু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "জানি না। মানুষটার সাথে বিশ বছর সংসার করলাম অথচ এখন মনে হচ্ছে মানুষটকে চিনি না। কী করবে বুঝতে পারছি না।"

"আব্বু যদি এসে বলে তোমাকে ফিরে যাবার জন্যে, তাহলে?"

"বলবে না।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি।" আম্মু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি যে আলতাফ নবীকে বিয়ে করেছিলাম এই মানুষটা তার থেকে ভিন্ন। একজন মানুষ যখন জীবনে খুব সাকসেসফুল হয় তখন সে অন্যরকম হয়ে যায়।"

"কী রকম হয়ে যায়?"

"জীবনে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা ধরতে পারে না। মনে করে—মনে করে—"

"কী মনে করে?"

আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মনে করে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে টাকা। তোর আব্বু যে আমার সাথে এরকম একটা ব্যবহার করতে পারল, তার কারণ কী জানিস?"

"কী?"

"তোর আব্বু জানে আমার কোন টাকা পয়সা নেই—আমি পুরোপরি তার ওপর নির্ভর করে আছি। তাই সে যেটা ইচ্ছা করতে পারে—আমাকে সেটা সহ্য করতে হবে।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তোমার টাকা পয়সা আছে?"

আম্মু হেসে বললেন, "কোথেকে থাকবে। বিয়ের গয়না আর অল্প কিছু নিজের সেভিংস আছে। একটা চাকরি নিয়ে নেবো।"

"তুমি চাকরি পাবে?"

"একশবার পাব। দেখিস তুই।"

"যদি না পাও?"

আম্মু আমার চুল টেনে বললেন, "সেটা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না। ঘুমা।"

আমি আর আম্মু দু'জনেই বিছানায় শুয়ে রইলাম, দু'জনের কারো চোখেই ঘুম নেই, কিন্তু দু'জনেই ভান করতে লাগলাম যেন ঘুমিয়ে গেছি। আম্মুর কথা জানি না, আমি ভান করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমাদের নতুন বাসাটা আমি যে ঘরে থাকতাম তার চাইতে ছোট। মগবাজারের কাছে চারতলায় একটা ছোট বাসা। মানুষ কেমন করে এত ছোট বাসায় থাকতে পারে কে জানে—আম্মুর মন খারাপ হচ্ছে কী না বুঝতে পারছি না—মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। বাসাটা কয়েকবার ঘুরে ফিরে দেখে বললেন, "কি ছিমছাম বাসা দেখেছিস?"

পুরো বাসাটাতে দুইটা রুম এবং একটা বাথরুম। ছোট এক চিলতে বারান্দা আছে, সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রান্নাঘরটা এতো ছোট যে দু'জন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না। ছিমছাম বলতে আম্মু নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছেন ছোট! তবে বাসাটার মাঝে পুরনো ভাবটা নেই—মনে হয় নতুন তৈরি করে মালিক ভাড়া দিয়েছে। জয়ন্ত কাকু হাসি হাসি মুখে বললেন, "বৌদি, তোমাদের বাসা তো হয়েছে, এখন চল।"

"কোথায়?"

"আমাদের বাসায়। আস্তে আস্তে ফার্নিচার, বাসন-কোসন বিছানাপত্র কিনে এসে উঠবে। কোন তাড়াহুড়ো নেই।"

"কী বলছ জয়ন্ত দা! সারা জীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি একটা বাসায় থাকব যেখানে কোন ফার্নিচার নাই। এই হচ্ছে সুযোগ!"

"একটা জায়গায় থাকার জন্যে মিনিমাম কিছু জিনিস লাগে—"

"আমি আর কাজল মিলে কিনে নেব।"

"আমাকে লিস্ট করে দাও, আমি ধীরেসুস্থে কিনে দেব।"

"উঁহু।" আম্মু মাথা নেড়ে বললেন, "নতুন একটা সংসার পাতছি এর মজাটাই হচ্ছে সেগুলো লিস্ট করে কেনা।"

জয়ন্ত কাকু বললেন, "তুমি যে কোনটাতে মজা পাও আর কোনটাতে মজা পাও না সেটা বোঝা খুব মুস্কিল।"

আম্মু হেসে বললেন, "পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে পিকনিকের মতো। পিকনিকের একটা আলাদা আনন্দ আছে না?"

কাজেই জয়ন্ত কাকু চলে যাবার পর আমরা আমাদের পিকনিকের জীবন শুরু করলাম। আম্মু বললেন, "শুধু তোর পড়শোনার জন্যে একটা চেয়ার আর ডেস্ক কিনতে পারি। এছাড়া কোন ফার্নিচার কেনা হবে না।"

"ঘুমাব কোথায়?"

"ফ্লোরে। ফ্লোরে ঘুমানোর মজা অন্যরকম। ফ্লোরে ঘুমালে কেউ গড়িয়ে পড়ে যায় না। আর মনে হয় পুরো ঘরটাই বিছানা।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি ঘুমিয়েছি না?" যখন ছোট ছিলাম, ঈদের সময় সবাই আসতো, তখন ফ্লোরে টানা বিছানা করা হতো, সেখানে শুয়ে ঘুম! কী মজাটাই না হতো।" আম্মুর মুখের হাসি দেখে মনে হল আসলেই ব্যাপারটা আনন্দের।

"এতোদিন আমাদের লাইফ ছিল একরকম। যা দরকার তার সব কিছু ছিল। যা দরকার না তারও সবকিছু ছিল।" আম্মু গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখন থেকে লাইফটা হবে অন্যরকম।"

"কী রকম হবে?"

"এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা হবে সবচেয়ে কম কী কী জিনিস দিয়ে থাকা যায়?"

"সবচেয়ে কম?"

"হ্যাঁ। একটা কাগজ আর কলম নিয়ে আয়, দেখি লিস্ট করে।"

ভাগ্যিস বের হবার সময় আমি আমার ব্যাকপেকটা নিয়ে বের হয়েছিলাম, ভেতরে কাগজ আর কলম দুই-ই আছে। আম্মু বলতে লাগলেন আর আমি লিখতে লাগলাম।"

১। দুইটা তোষক, দুইটা চাদর, দুইটা বালিশ, আর দুইটা মশারি।
২। দুইটা তোয়ালে।
৩। সাবান, টুথপেস্ট এবং চিরুনি।
৪। প্লাস্টিকের বালতি এবং মগ।
৫। দুইটা থালা, দুইটা গ্লাস চারটি বাটি এবং একটি চাকু।
৬। দুইটা ডেকচি, একটা সসপ্যান এবং কয়েকটা চামুচ।
৭। বাসন ধোয়ার সাবান।
৮। দিয়াশলাই।
৯। চাউল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, গুঁড়া মশলা, লবণ এবং তেল।
১০। চারটা ডিম, আধা কেজি আলু।

১১। গুঁড়ো দুধের কৌটা, চায়ের টি–ব্যাগ, চিনি এবং রুটি।
১২। ঝাড়ু এবং ময়লা ফেলার ডাস্টবিন।

আম্মু লিস্টটা দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, "দেখেছিস কী কমপ্লিট লিস্ট? সব কিছু আছে। রাতে ডিনার করতে পারবি, সকালে নাস্তা করতে পারবি। ইচ্ছে করলে বিকেলে চা পর্যন্ত খেতে পারবি।"

"এগুলো কিনবে কী করে?"

"সেটা আবার সমস্যা নাকি। আয় আমার সাথে।"

কাজেই আমি আর আম্মু সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে আমাদের নতুন সংসারের জিনিসপত্র কেনাকাটা করলাম। দুপুরে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে খেয়ে নিলাম, কেনাকাটা করা নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রমের ব্যাপার, যা খিদে পেয়েছিল সে আর বলার মতো নয়।

সন্ধ্যেবেলা আম্মু হৈচৈ করে রান্না করতে শুরু করলেন। আমি আম্মুকে কখনো রান্না করতে দেখিনি, কিন্তু দেখলাম বেশ ভালোই রান্না করতে পারেন। প্রথম দিন বলে মেনুটা খুব সহজ, ভাত, আলু, ডিমের তরকারি এবং ডাল। আমিও আম্মুকে সাহায্য করলাম তারপর ঘরের মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে যখন খেতে বসেছি তখন জয়ন্ত কাকু আর মাধুরী খালা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে এলেন—আমাদের নতুন বাসার প্রথম মেহমান। হাতে মিষ্টির প্যাকেট।

আম্মু তাদের খাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করলেন, তারা খেয়ে এসেছেন বলে শুধু চেখে দেখে খুব ভালো রান্না হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দিলেন। খাওয়ার পর মাধুরী খালা আর আম্মু মিলে থালা বাসন ধুয়ে চা তৈরি করে আনলেন। কেউ মগে কেউ গ্লাসে করে চা খেলো—সাথে জয়ন্ত কাকুদের মিষ্টি। আমি সারা জীবনেই কোন কিছু খুব সখ করে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না, কিন্তু আজ সবকিছু খুব মজা করে খেলাম—এর কারণটা কী কে জানে!

জয়ন্ত কাকুরা চলে যাবার পর আমরা দু'জন দুটি বিছানা করে মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, কেউ একজন বেল বাজাচ্ছে। আমি ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেখি আমাদের নতুন বাসার দ্বিতীয় মেহমান এসেছেন—আমার আব্বু।

আব্বু কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, তার চোখে এক ধরনের বিস্ময়। আমি বললাম, "আব্বু, তুমি?"

আব্বু কোন কথা না বলে ভেতরে ঢুকলেন, ভেতরে বসার কোন চেয়ার নেই, আব্বু এদিক সেদিক ঘুরে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। আম্মু মশারির ভেতর থেকে মাথা বের করে বললেন, "কী ব্যাপার?"

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি যে আব্বুর হাতে একটা রংচংয়ে খবরের কাগজ, আব্বু সেটা আম্মুর দিকে ছুড়ে দিয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "এসব কী?"

আম্মু অবাক হয়ে বললেন, "কীসব কী?"

"এই ট্যাবলয়েডে কী ছাপা হয়েছে?"

আম্মু বললেন, "কী ছাপা হয়েছে?"

"আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা। কে দিয়েছে এই সব খবর?"

আম্মু ট্যাবলয়েডটা খুললেন। প্রথম পৃষ্ঠাতেই আব্বুর ছবি পাশে সিনমার নায়িকার মতো দেখতে একটি মেয়ের ছবি, তার নিচে বড় বড় করে লেখা, "শিল্পপতির অনৈতিক কার্যকলাপ : স্ত্রী–পুত্র নিখোঁজ।"

আম্মু খবরটিতে চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখলেন, ভেতরে কী লেখা আছে পড়ার উৎসাহ দেখালেন না। খবরটা পড়ার জন্যে আমি মরে যাচ্ছিলাম কিন্তু এখন সেটা করা উচিত হবে কী না আমি বুঝতে পারলাম না।

আব্বু গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এসব বলেছ খবরের কাগজের মানুষদের?"

আম্মু শীতল গলায় বললেন, "না।"

"তাহলে তারা এসব কোথা থেকে জানল?"

আম্মু হঠাৎ কেমন জানি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, তীক্ষ্ণ গলায় অধৈর্য স্বরে বললেন, "দেখো আলতাফ—আমি তোমাকে এখানে ডাকিনি। তুমি নিজে থেকে এসেছ। আমরা এক সাথে বিশ বছর ছিলাম—সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি। চারদিন পর এসে আমাদের ভালোমন্দ কিছু জানতে চাইলে না এসেই চিৎকার শুরু করে দিলে।"

"কিন্তু—"

"যা করবে নিজের দায়িত্বে করবে। এই ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকেরা হচ্ছে মাছির মতো। যেখানেই নোংরা জিনিস পায় সেখানেই তারা যাচ্ছে। কাজেই নোংরামোগুলো নিজের দায়িত্বে করবে—আমাদেরকে টানাটানি করবে না।"

আব্বু কিছুক্ষণ হিংস্র চোখে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, "তোমার বাসাতেও কিছু বল নাই, সবাই এসে আমার সাথে ঝগড়াঝাঁটি—"

"আমার বাবা–মা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকলে আই এম সরি। আমি আগে তাদেরকে জানাইনি কারণ তারা এটা গ্রহণ করতে পারবে না। এখন খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে এসেছি, এখন যাব।"

আব্বু মুখে বাঁকা এক ধরনের হাসি এনে চারদিকে এক নজর দেখে বললেন, "এইটা তোমাদের গুছিয়ে নেওয়া?"

"হ্যাঁ।"

আব্বু এবার হেসে ফেললেন, বললেন, "দেখো শায়লা, তুমি পুরো জিনিসটা কঠিন করে ফেলেছ। জীবনটা আসলে নাটক না।"

"আমি জানি।"

"তোমাদের ধারণা—তুমি এভাবে থাকতে পারবে?"

"সেটা আমার মাথাব্যথা।"

"দেখো শায়লা, যার জোর আছে তার জোর দেখানো মানায়। যার নেই তার জোর দেখানো হচ্ছে একটা ফাজলামো।"

আমি দেখলাম আম্মু অসম্ভব রেগে উঠলেন কিন্তু অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ আলতাফ?"

"আমি খুব সোজা একটা জিনিস বলতে চাইছি। তুমি সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছ কিন্তু তোমার চলতে হবে আমার টাকায়। তাহলে তোমার এই নাটকের কী অর্থ?"

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আমি তোমার টাকায় চলবো?"

"তা নাহলে কী? আর সবকিছু ছেড়ে দাও—শুধু কাজলের স্কুলের বেতনের কথাটাই ধরো। তুমি জান তার স্কুলের বেতন কতো? তুমি নিজে সেটা দিতে পারবে? আমি যদি সেই বেতন না দেই তুমি ওর লেখাপড়ার খরচ চালাতে পরবে?"

আম্মু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আব্বু বাধা দিয়ে বললেন, "আমি সব খোঁজ নিয়েছি। তোমার মুরোদ কতখানি আমি জানি। তোমার সব মিলিয়ে কয় পয়সা আছে সেটাও আমি জানি। তোমার বাবা-মায়ের কী আছে না আছে সেটাও আমি জানি। আমি লিখে দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের ভেতরে তুমি আর তোমার ঐ বেয়াদব ছেলে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার পা ধরে বলবে—"

আম্মু চিৎকার করে বললেন, "আলতাফ।"

"কী হয়েছে?"

"তুমি এখন যাও। তা নাহলে—"

"না হলে কী?"

"না কিছু না।" আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছু না।"

আব্বু সিনেমার ভিলেনদের মতো ভঙ্গি করে একবার হাসলেন, তারপর গটগট করে হেঁটে বের হয়ে গেলেন।

আম্মু অনেকক্ষণ তার হাঁটুতে মুখ রেখে বসে রইলেন, দেখে মনে হল যেন একটা পাথরের মূর্তি। আমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বললাম, "আম্মু।"

"কীরে কাজল?"

"তোমার খুব মন খারাপ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কেন আম্মু?"

"কারণ তোর আব্বু যেটা বলেছে তার মাঝে খানিকটা সত্যি কথা আছে। তিন মাস পরে আসলেই আমার সব টাকা ফুরিয়ে যাবে—"

আম্মুর কথা শুনে আমার ভয় পেয়ে চমকে ওঠার কথা ছিল কিন্তু কী আশ্চর্য আমি একটুও ভয় পেলাম না, উল্টো আমার ভেতরে কেমন জানি জিদ চেপে গেল। আমি আম্মুর কাছে গিয়ে তাকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললাম, "আম্মু তুমি কোন চিন্তা করো না।"

আম্মু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "কোন চিন্তা করব না?"

"না। দরকার হলে আমরা দিনে এক বেলা খাব। দরকার হলে আমি টেম্পোর হেল্পার হয়ে যাব—"

আম্মু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ হি হি করে হাসতে শুরু করলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "কী হল? তুমি হাসছ কেন?"

"তুই টেম্পোর হেল্পার হয়ে চিৎকার করছিস 'ফার্মগেট-ফার্মগেট-ফার্মগেট' তারপর লাফ দিয়ে চলন্ত টেম্পোতে উঠে যাচ্ছিস সেই দৃশ্যটা চিন্তা করে—"

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "তুমি ভাবছ দরকার হলে আমি পারব না?'

আম্মু খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কাছে টেনে এনে গালে ধ্যাবড়া করে একটা চুমু দিয়ে বললেন, "তোর আব্বু সকালেই আমার মনটা খুব খারাপ করে দিয়েছিল, তুই মনটা ভালো করে দিলি।"

আমি গাল মুছতে মুছতে বললাম, "সেটা বলার জন্যে তোমার এই রকম ধ্যাবড়া করে চুমু দিতে হল? আমি কতো বড় হয়েছি জান?"

"জানি।" আম্মু মুখ টিপে বললেন, "সেই জন্যেই তো দিচ্ছি—কয়দিন পর তো আর দিতে দিবি না।"

আমি মশারির রশিগুলো খুলতে খুলতে বললাম, "তোমার প্রথম কাজ কী জান?"

"কী?"

"আমাকে ছোটখাট একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। যেখানে স্কুলের বেতন কম।"

আম্মু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই পারবি?"

আমি বুকে থাবা দিয়ে বললাম, "একশবার পারব।"

ঠিক কী কারণ জানি না, আমার মনে হতে থাকে পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কোন কাজ নেই। আমি আগে মনে হয় সব সময় লুতুপুতু একটা ছেলে ছিলাম, এখন হঠাৎ করে মনে হয় কঠিন একটা বড় মানুষ হয়ে যাচ্ছি।

ভর্তির কাজকর্ম শেষ করে আমি যখন ক্লাসে এসেছি ততক্ষণে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। ক্লাস টিচার একজন মোটাসোঁটা মহিলা, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও, তুমি আমাদের নতুন ছাত্র! ভাঙ্গা বছরের ছাত্র?"

আমি মাথা নাড়লাম। ক্লাস টিচার মুখ সুঁচালো করে বললেন, "বছরের মাঝখানে থেকে ক্লাস শুরু করা খুব কঠিন। জান তো?"

"আমি মাথা নাড়ালাম, বললাম "জানি।"

"যাও, ক্লাসে বসো।" ম্যাডাম ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তোরা একে বসার জায়গা করে দে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার নামটা যেন কী?"

"কাজল।"

"পুরো নাম।"

আমি মনে মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমার আব্বু আর আম্মু দুই বছর আমেরিকা ছিলেন, তখন তাদের এক প্যালেস্টাইনের বন্ধুর সাথে পরিচয় হয়েছিল, সেই বন্ধুর কথা বলতে গেলে এখনো তাদের চোখ আনন্দে চকচক করতে থাকে এবং সেই বন্ধুটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। আমার আব্বু আর আম্মু তার নামে আমার নাম রেখেছেন—যে নামটি প্যালেস্টাইনে হয়তো খুব সুন্দর একটা নাম—কিন্তু এই দেশে সেই নামটা একটা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু না। কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে আমি কাজল বলেই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু আজ আর রেহাই নেই বলে মনে হল। ক্লাসের অন্য কেউ শুনতে না পারে সেভাবে বললাম, "ফাওয়াজ নবী।"

ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী নবী?"

"ফাওয়াজ নবী?"

ম্যাডাম এবারও বুঝতে পারলেন না, কানটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ফা—?"

"ফাওয়াজ" এবং আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নামটা বানান করে দিলাম। ম্যাডাম কিছুক্ষণ রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নামের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং নেম।"

আমি এই চ্যাপ্টারটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে দেয়ার জন্যে দ্রুত মাথা নেড়ে ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝামাঝি একটা বেঞ্চ খালি আছে, সেখানে বসে যাওয়া যাবে। আমার আগের স্কুলের তুলনায় এই স্কুলটা একেবারেই সাদাসিধে। রং ওঠা দেওয়াল, পুরনো বেঞ্চ, বিবর্ণ ব্ল্যাক বোর্ড। ছেলেমেয়েগুলো অবশ্যি অন্যরকম। ঠিক কোন জিনিসটা অন্যরকম আমি সেটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

আমি যার পাশে বসেছি সে আমার দিকে মাথা এগিয়ে নিচু গলায় বলল, "ফাওয়াজ আবার কী রকম নাম?"

"প্যালেস্টাইনের।"

"প্যালেস্টাইনের নাম বাংলাদেশে দিয়ে লাভ আছে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "নাই।"

ছেলেটা একটু গরম হয়ে বলল, "তাহলে?"

আমি বললাম, "আমি নাম রেখেছি নাকী?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক। তোর দোষ নাই। কিন্তু দেখিস তোর লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে। বিয়ে পর্যন্ত হবে না।"

আমি ছেলেটার দিকে তাকালুম, ইয়ারকি মারছে না, বেশ গুরুত্ব দিয়েই কথা বলছে। আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিংশুক চৌধুরী।"

"বাহ্। কী সুন্দর নাম।"

কিংশুক আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "তোর কাছে সুন্দর মনে হল?"

"কেন? তোমার পছন্দ না।"

"না। আমার বাবা মা দুইজনেই কবি সেইজন্যে আমার এই অবস্থা। কপাল ভালো আমি মেয়ে হয়ে জন্মায়নি। তাহলে আমার নাম রাখা হতো কিংবদন্তি। চিন্তা করতে পারিস?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না।" কিংশুক নামটি বেশ, কিন্তু কিংবদন্তি কী কারো নাম হতে পারে?

কিংশুক আমার কানের কাছে মাথা এনে বলল, "আমাকে সবাই কী ডাকে জানিস?"

"কী।"

"কেউ ডাকে কিংকং কেউ ডাকে অসুখ অন্যেরা ডাকে হিংসুক। কিংশুক থেকে হিংসুক।"

আমি মুখ টিপে হাসলাম। কিংশুক চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই হাসছিস যে? তোকে ছেড়ে দেবে ভেবেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম, আমি জানি আমাকেও ছেড়ে দেবে না। আমাদের মোটাসোঁটা ম্যাডাম বললেন, "কী হল, ক্লাসে এতো কথা কেন?"

ক্লাসের নানা জায়গায় যে রকম ছোট ছোট কথাবার্তা শুরু হয়েছে সেগুলো হঠাৎ করে থেমে গেলো। আমরাও চুপ করে গেলাম। মোটাসোঁটা ম্যাডাম এলজেব্রা পড়াতে শুরু করলেন।

ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল থেকে হঠাৎ করে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে এসে আমার যে রকম অসুবিধে হবে ভেবেছিলাম—দেখা গেলো সে রকম অসুবিধে হল না। ক্লাসের সবাই অপছন্দ করে ইংরেজি ক্লাসগুলোকে আর আমার জন্যে সেগুলো হল সবচেয়ে সহজ। অঙ্ক ক্লাসই বের হল সবচেয়ে ঝামেলার—ইংরেজি লিখে লিখে অভ্যাস হঠাৎ করে বাংলায় লিখতে গিয়ে হাত জড়িয়ে যায়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় চার এবং আট নিয়ে, প্রত্যেকবার বাংলা চারকে আট ধরে হিসেব করে বসে থাকি।

টিফিন পিরিয়ডে কিংশুক আমাকে অন্য সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিল। ফর্সা মতোন চশমা পরা একটা ছেলেকে ডেকে বলল, "বুঝলি কাজল, এই ক্লাসে থাকতে হলে সবার আগে তোর খালেদের সাথে পরিচয় থাকতে হবে।"

"কেন?"

"কারণ খালেদ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট মানুষ। সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। ডিবেটে ফার্স্ট হয়। গলা কাঁপিয়ে দারিদ্র্য কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। ক্লাস ম্যাগাজিনের সম্পাদক আর ক্লাস ক্যাপ্টেন।"

এরকমভাবে কাউকে পরিচয় করিয়ে দিলে তার ঠাট্টা করে ব্যাপারটা হালকা করে দেওয়ার কথা। কিন্তু খালেদ প্রশংসাটা হজম করে মোটামুটি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিংশুক বলল, "তুই যদি কোন জ্যামিতির উপপাদ্য প্রমাণ করতে না পারিস তাহলে খালেদের কাছে নিয়ে আসবি। ইংরেজি ট্রান্সলেশানে আটকে যাস খালেদের কাছে নিয়ে আসবি। তাই না খালেদ?"

খালেদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। তখন আমি বুঝতে পারলাম ছেলেটা পড়াশোনাতে ভালো হলেও একটু বোকা। সবসময়েই এরকম হয়, একজন মানুষ হয়তো সব দিক দিয়ে বুদ্ধিমান এবং চালাক–চতুর কিন্তু একদিক দিয়ে চরম বোকা।

কিংশুক তখন গাট্টাগোট্টা একটা ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "আর এই যে দেখছিস এ হচ্ছে ইফতি, চেষ্টা করবি এর থেকে দূরে থাকতে।"

আমি বললাম, "কেন?"

ইফতি এক গাল হেসে বলল, "কারণ আমি হচ্ছি খালেদের উল্টা।"

"উঁহু।" কিংশুক মাথা নাড়ল, "ক্লাসে আমরা সবাই খালেদের উল্টা। সেইটা ব্যাপার না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে কোনটা ব্যাপার?"

"ইফতি হচ্ছে ক্লাস সন্ত্রাসী। বড় হয়ে যে যখন চাঁদাবাজি করবে আর ফেন্সিডিলের ব্যবসা করতে তখন তার নাম হবে গাল কাটা ইফতি। তাই না রে ইফতি?"

ইফতি ভালো মানুষের মতো হাসল, বলল, "এখানো ঠিক করি নাই। তোকে আচ্ছামতো সাইজ করে 'কিংশু সাইজ ইফতি' নাম নিলে কেমন হয়?"

এই ছেলেটাকে আমার বেশ পছন্দ হল। খালেদের মতো বোকা না বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।

কিংশুক তখন আমাকে টেনে ক্লাসের অন্য পাশে নিয়ে গেলো সেখানে কয়েকজন মেয়ে খুব উত্তেজিত গলায় কথাবার্তা বলছিলো। আমাদের দেখে চুপ করে গেল। কিংশুক বলল, "বুঝলি কাজল, ক্লাসে যদি ভালো মতন বেঁচে থাকতে চাস তাহলে এই এদের সাথে কখনো কোন গোলমাল করবি না।"

শ্যামলা রংয়ের তেজী টাইপের একটা মেয়ে বলল, "কেন রে হিংসুক, নতুন একজন মানুষ এসেছে এখনই তার সাথে কূটনামি শুরু করলি?"

"আমি মোটেই কূটনামি করছি না, সত্যি কথা বলছি।" কিংশুক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই যদি কোন বইপত্রে পড়ে থাকিস—মেয়েরা হচ্ছে অবলা তাহলে সেটা ভুলে যা। ওগুলো পুরনো আমলের কথা। এখন অন্যযুগ।"

"এখন কী যুগ?"

"এখন হচ্ছে মেয়েদের অত্যাচার থেকে সাবধানে বেঁচে থাকার যুগ।"

তেজী টাইপের মেয়েটা বলল, "কখন আমরা তোদের ওপর অত্যাচার করলাম?"

"কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে সেইটা নিয়ে কথা বলবে?"

তেজী টাইপের মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিংশুকের অনেকগুলো নাম আছে। তার মাঝে একটা হল ভ্যাদর ভ্যাদর কিংশুক। তার হবি হচ্ছে সবসময় ভ্যাদর ভ্যাদর করা।"

কিংশুক আপত্তি করে বলল, "আমি কখনও ভ্যাদর ভ্যাদর করি না।"

"এই যে এতক্ষণ ধরে করছিস। এটা তাহলে কী?"

"একটা নতুন ছেলে এসেছে, তাকে ক্লাসে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, সেটা ভ্যাদর ভ্যাদর হল?"

"ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, আজকে মাফ করে দেয়া হল।"

কিংশুক তেজী টাইপের মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, "এর নাম হচ্ছে তৃণা। এডুকেশান উইকে ভুলেভালে কীভাবে কীভাবে জানি একবার রবীন্দ্র সঙ্গীতে ফাস্ট প্রাইজ পেয়ে গিয়েছিল, আরেকবার কবিতা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিল সেই থেকে অহংকারে এই মেয়ের মাটিতে পা পড়ে না।"

মেয়েটা মারার ভঙ্গি করে বলল, "দেবো ধরে একটা! আমার অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না?"

"পড়ে নাই তো!" কিংশুক গম্ভীর মুখে বলল, "এর নাম হচ্ছে তৃণা এর প্রধান কাজ হচ্ছে ঘৃণা। আমাদেরকে কোন পাত্তা দেয় না। তোকেও দেবে কী না জানি না।"

তৃণা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ইস রে। কিংশুকটা যে কী বাজে কথা বলতে যাবে।"

কিংশুক অন্য দুইজন মেয়েকে দেখিয়ে বলল, "আর এই দুইজন হচ্ছে সুমি আর শারমিন। দুইজন প্রাণের বন্ধু। এমনই প্রাণের বন্ধু যে একজনকে চিমটি কাটলে আরেকজন ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুই চিমটি কেটে দেখ।"

আমি হেসে বললাম, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম আর পরীক্ষা করে দেখতে হবে না।"

"নতুন এসেছিস বলে তুই পরীক্ষা করতে লজ্জা পাচ্ছিস? কয় দিন থাক তাহলে বুঝতে পরবি। ক্লাসে স্যার একজনকে বকে দিলে আরেকজন ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়।"

শারমিন চোখ পাকিয়ে বলল, "কোনদিন আমি ভ্যাঁ করে কাঁদলাম?"

"চোখে পানি টলটল করা আর ভ্যাঁ করে কাঁদার মাঝে কোন পার্থক্য নাই। যাই হোক মেয়েরা, আমার কাজলকে আরো অনেকের সাথে পরিচয় করাতে হবে। তোদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এ হচ্ছে কাজল। ভালো নাম ফাওয়াজ খান—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "ফাওয়াজ খান না, ফাওয়াজ নবী।"

"একই কথা।" কিংশুক গম্ভীর গলায় বলল, "কাজলের জন্ম প্যালেস্টাইনে। ওর বাবা যখন প্যালেস্টানে ইজরাইলের সাথে যুদ্ধ করছিলেন—"

"তোমরা এতো বড় ভূমিকা দেওয়ার দরকার নেই। আমার বাবা কখনো প্যালেস্টাইনে ছিলেন না।"

"একটু আগে যে বললে—"

"বলেছি নামটা প্যালেস্টাইনি একজন মানুষের। কিন্তু তার সাথে আমার আব্বু আর আম্মুর দেখা হয়েছিল আমেরিকা। সেই প্যালেস্টাইনের মানুষটা আমার এই উপকারটা করে গেছেন। আমি দুই চোখে দেখতে পারি না নামটাকে।"

"পিকিউলিয়ার নেম।" কথা শুনে তাকিয়ে দেখলাম কখন জানি খালেদ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার ফর্সা ত্যালতেলে মুখে গম্ভীর হয়ে বলল, "একজন মানুষের নামটা খুব ইম্পরট্যান্ট। নাম থেকে চরিত্রের ওপর ছাপ পড়ে যায়।"

কিংশুক একগাল হেসে বলল, "যেমন তোর নাম খালেদ সেখানে থেকে তোর মাঝে লেদ মেশিনের ছাপ পড়ে গেছে?"

খালেদ গম্ভীর গলায় বলল, "সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করবি না কিংশুক।"

কিংশক স্যালুট করার ভঙ্গি করে বলল, "ইয়েস ক্যাপ্টেন।"

খালেদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার একটা সমস্যা হবে মনে হয়।"

"কেন?"

"তোমার নাম ফাওয়াজ, শুনলে আওয়াজ আওয়াজ মনে হয়।" কথা শেষ করে খালেদ দাঁত বের করে হাসল।

খালেদ নামের এই ত্যালতেলে ছেলের ওপরে আমার একটু মেজাজ গরম হয়ে উঠল কিন্তু আমি কিছু বললাম না। মানুষের পছন্দের ব্যাপারটা মনে হয় দুইদিক থেকে কাজ করে। যেরকম খালেদকে আমার বেশি পছন্দ হয়নি—তারও সেরকম আমাকে পছন্দ হয়নি। আমি যেরকম আমার ব্যাপারটা গোপন রেখেছি খালেদ সেরকম গোপন রাখল না, প্রকাশ করে ফেলল, বলল, "ফাওয়াজ শুনলে শুধু আওয়াজ মনে হয় না। আরও একটা জিনিস মনে হয়। সেটা কী জান?"

আমি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, "কী?"

"ফাঁকা আওয়াজ।" খালেদ সাংঘাতিক বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা বলে ফেলেছে এরকম ভঙ্গি করে সবার দিকে তাকাল কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই কেউ হি হি করে

হেসে উঠল না। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি এই একই কথাটি যদি কিংশুক বলতো তাহলে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতো—আমিও কিছু মনে করতাম না।

খালেদ অবশ্যি এতো সহজে হাল ছেড়ে দিল না, একেবারে কোন কারণ ছাড়াই আমার পেছনে লেগে রইল, ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার ডাক নাম কাজল?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ।"

"তোমার ভালো নামটা পিকিউলিয়ার আর ডাক নামটা ভুল।"

"ভুল?"

"হ্যাঁ। কাজল হচ্ছে মেয়েদের নাম। আমার এক খালার নাম কাজল। আমার ফুপাতো বোনের নাম কাজল। আমাদের বাসার কাজের বুয়ার নামও কাজল।"

খালেদ মুখে ত্যালতেলে ভাব করে সবার দিকে তাকাল—আমার ইচ্ছে করছে ধরে খালেদের ঘাড়ে একটা ঘুষি বসাই। আমি এরকম একশটা ছেলে বের করতে পারি যাদের নাম কাজল। কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো ছেলে-মেয়ে দু'জনকেই দেয়া যায়। কাজল হচ্ছে সেরকম একটা নাম। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে করল না। খালেদ মুখে খুব সমবেদনার একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমার বাবা মা তোমাকে মেয়েদের একটা নাম দিল কেন?"

আমার আবার সত্যি সত্যি ইচ্ছে করল খালেদের নাকে একটি ঘুষি বসিয়ে দেই, কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললাম, "সেইটা একটা ইন্টারনেস্টিং গল্প।"

খালেদ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী গল্প?"

"আমি আমার আব্বু আম্মুর প্রথম বাচ্চা। এর আগে তারা কখনো ছোট বাচ্চা দেখে নাই। আমার যখন জন্ম হল তারা বুঝতে পারছিল না আমি ছেলে না মেয়ে—সেটা বোঝার জন্যে কোথায় দেখতে হয় জানতো না—কেউ বলেও দেয় নাই।"

খালেদের মুখ হা হয়ে গেল, সেইভাবে বলল, "তুমি বলতে চাইছ—"

"হ্যাঁ। আব্বু আর আম্মু মনে করেছে আমি মেয়ে, তাই মেয়ের নাম দিয়ে বসে থেকেছে।"

খালেদ আবার বলল, "তুমি বলতে চাইছ—"

আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, "হ্যাঁ। আমার বয়স যখন চার তখন প্রথম ধরা পড়লো যে আমি ছেলে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

খালেদ আবার মুখ হা করল কিছু বলার জন্যে কিন্তু ততক্ষণে অন্য সবাই গলা ফাটিয়ে হি হি করে হাসতে শুরু করেছে। তৃণা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুই এরকম মিচকি শয়তান—মুখ দেখে বোঝাই যায় না—হি হি হি—"

আমি খানিকক্ষণ হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে বললাম, "কেন? তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

খালেদ হঠাৎ করে বুঝতে পারল আমি তার সাথে টিটকিরি মেরেছি এবং তার ফল হল ভয়ানক। সে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছেলে এবং সবাই তাকে তোয়াজ করে চলে হঠাৎ করে আমার মতো একজন নতুন ছেলে এসে তার সাথে এরকম ফাজলেমি করবে ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই করতে পারল না। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সে নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অন্যেরা তখনও হাসছে এবং আমিও তখনো হাসিতে যোগ দিলাম। হাসতে হাসতে তৃণার চোখে পানি এসে গেল সে চোখ মুছে বলল, "কাজল, তুই আসলেই ফানি মানুষ!"

তৃণা মেয়েটি কী সহজেই আমাকে তুই বলে ফেলল। আমার মুখে এতো সহজে তুই আসতে চায় না তবু চেষ্টা করলাম, "সারা জীবন সবাই আমার নাম নিয়ে টিটকারি করে গেলো—তোরাই বল আর কতো সহ্য করব?"

তৃণা ভদ্রতা করে বলল, "এমন কিছু তো খারাপ নয় নামটা।"

"খারাপ-ভালো জানি না—আমি চাই পরিচিত নাম। যেন কাউকে বললে নামটা বুঝতে পারে। সারা জীবনে একবারও হয় নাই যে আমি নামটা বলেছি আর মানুষ বুঝে মাথা নেড়েছে।" আমি সত্যি সত্যি বুকের গভীর থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "কম করে হলেও তিনবার নামটা বলতে হয়—তারপরেও নামটা বুঝতে পারে না তখন বানান করতে হয়।"

কিংশুক বলল, "চিন্তা করিস না কাজল। তুই বড় হয়ে খুব বিখ্যাত মানুষ হয়ে যা তখন সবাই এই নামটা জেনে যাবে। তোর বানান করতে হবে না। পাবলিকেই বানান করে নেবে।"

আমি বললাম, "বিখ্যাত হওয়া এতো সোজা?"

"তাহলে সন্ত্রাসী হয়ে যা—সবাই তোর নাম জেনে যাবে। ফাগল ফাওয়াজ না হয় ফাটা ফাওয়াজ—"

একটু আগেই খালেদ আমার নাম নিয়ে টিটকারি মেরেছে কেউ হাসেনি, এখন কিংশুক একই জিনিস করল কিন্তু সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সবার সাথে আমিও।

স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বের হয়ে দেখি আম্মু গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সকালেও আম্মু এসে পৌঁছে দিয়ে গেছেন—এই প্রথম গাড়ি ছাড়া আমি স্কুলে এসেছি আবার গাড়ি ছাড়া স্কুল থেকে বাসায় যাচ্ছি—আম্মুর সেটা নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তা। আমার আগের স্কুলে ছুটির পর ছেলেমেয়েদের নেয়ার জন্যে হাজার হাজার গাড়ি আসতো এবং গাড়িতে পুরো এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেতো। এখানে সেরকম কিছু নেই, দুই একটি গাড়ি এসেছে, বেশ কিছু রিকশা কিন্তু বেশির ভাগই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আম্মু গেট থেকে বের হওয়া ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাকে বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস কাজল?"

"কী আম্মু?"

"তোর আগের স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা দেখতে একটু অন্যরকম।"

আমি একটু অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকালাম—আমারও সেটা মনে হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না পার্থক্যটা কোথায়। আম্মু বললেন, "তোর আগের স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা ছিল বড়লোকের ছেলেমেয়ে, এইখানে মিডল ক্লাস ফ্যামেলির ছেলেমেয়ে। বড়লোকের ছেলেমেয়েরা মনে হয় একটু মোটা বেশি হয়।"

আম্মু ঠিকই বলেছেন এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ কেমন জানি ছিপছিপে শ্যামলা, সবার মাঝে একধরনের তেজী তেজী ভাব। আমার আগের স্কুলের ছেলেমেয়েরা

ফর্সা, নাদুস-নুদুস আর তাদের মাঝে একটা ঢিলেঢালা ভাব। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম তৃণা তার বন্ধুদের সাথে বের হয়ে এলো, আমাকে দেখে হাত নেড়ে কয়েকজন মিলে ছুটে একটা চলন্ত টেম্পোতে উঠে গেল। এখানকার মেয়েরা কী সুন্দর ছুটে টেম্পোতে উঠে যায় অথচ আমি ছেলে হয়েও এর আগে কখনো গাড়ি ছাড়া কোথাও যাইনি।

আম্মু বললেন, "আয় যাই।" আমার ব্যাকপেকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর ব্যাগটা আমাকে দিবি?"

"কী বলছ আম্মু?"

"তোর তো নিয়ে অভ্যাস নাই।"

"কোন কোন জিনিসের অভ্যাস লাগে না।" আমি আগে আগে হাটতে শুরু করলাম, আম্মু পেছন থেকে ডেকে বললেন, "দাঁড়া একটা রিকশা নিই।"

"না আম্মু, চল হেঁটে যাই। বেশি দূর তো নয়।"

আম্মু হেসে বললেন, "একদিনেই এতো কঞ্জুস হয়ে যাস নে—আমার কাছে রিকশা ভাড়া আছে।"

"থাকুক। আজ হেঁটে যাই। হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।"

আম্মু বাধ্য হয়ে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "কেমন হল তোর স্কুল?"

"ভাল।"

"ইংলিশ মিডিয়াম থেকে বাংলা মিডিয়াম—কোন অসুবিধা হয় নাই?"

"নাহ।"

"ছেলেমেয়েরা কী রকম?"

"খুব ভালো আম্মু। খুব ফ্রেন্ডলি।"

আম্মু শুনে একটু খুশি হলেন, বললেন, "নতুন বন্ধু হয়েছে কেউ?"

"একদিনে কী বন্ধু হয়? আস্তে আস্তে হবে। এখন পরিচয় হয়েছে।"

"কেউ কি জানে তোর সম্পর্কে?"

"না।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না জানলেই ভালো।"

আম্মু মাথা নাড়লেন, বললেন, "তা ঠিক। না জানলেই ভালো।"

হাঁটতে হাঁটতে আম্মু একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দাঁড়া তোর জন্যে একটা টিফিন বক্স কিনে নিই।"

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, বললাম, "না, আম্মু কেউ এখানে টিফিন বক্স ব্যবহার করে না।"

"তাহলে টিফিন আনে কীসে করে?"

"কেউ টিফিন আনে না। যাদের আনতে হয় প্লাস্টিকের বাক্সে করে নিয়ে আসে।"

আম্মু তবু আবার চেষ্টা করলেন, আমি হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলাম। হাঁটতে বললাম, "একটা জিনিস জান আম্মু?"

"কী?"

"আমাদের আগের স্কুলে একটা লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেকশান আছে। ছেলেমেয়েরা কোন জিনিস হারালে সেখানে রাখে। সেখানে হাজার হাজার জিনিস আছে—কেউ নিতে আসে না।"

"নিতে আসে না?"

"না। সবাই এতো বড়লোক—একটা কিছু হারালে সেটা আর খুঁজে না, আরেকটা কিনে ফেলে!"

"কী কী আছে সেখানে?"

"সবকিছু! টিফিন বক্স, ওয়াটার বটল, ক্যালকুলেটর, বই, জ্যামিতি বক্স, ব্যাকপেক, সোয়েটার—কেউ খুঁজেও দেখে না!"

আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝলি ঠিকভাবে গরিব হয়ে থাকা খুব সোজা। কিন্তু ঠিকভাবে বড়লোক হয়ে থাকা খুব কঠিন! বেশির ভাগ মানুষই গোলমাল করে ফেলে। আমিও করে ফেলেছিলাম।"

আমি আম্মুর মুখের দিকে তাকালাম—কথাটার কী মানে কে জানে!

বলা যেতে পারে আমার পুরো জীবনে আমি যেসব কাজ করিনি গত দুই সপ্তাহে সেগুলো করে ফেলেছি। বাইরের মানুষের কাছে সেগুলোর হয়তো কোনই গুরুত্ব নেই—সত্যি কথা বলতে কি তারা হয়তো শুনে হাসাহাসি করবে কিন্তু আমার জীবনে সেগুলো হচ্ছে যুগান্তকারী ঘটনা। যেমন ধরা যাক স্কুলে যাবার ব্যাপারটা, আমি আজকাল একা হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাই। দুই সপ্তাহ আগে সেটা কেউ চিন্তাও করতে পারতো না। ড্রাইভার চাচা শুনলেই মনে হয় হার্টফেল করে ফেলতেন। ব্যাপারটা এতো সোজা কিন্তু কেউ আমাকে করতে দেয়নি। আগে যখন গাড়ি করে যাওয়া-আসা করেছি গাড়ি হুস করে বের হয়ে গেছে, রাস্তার পাশের লোকজনকে দেখারই কোন সুযোগ পাইনি। এখন হেঁটে হেঁটে যাবার সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি—মুচি জুতো সেলাই করছে, ফুলের দোকানে ফুলের তোড়া তৈরি করছে, কানা ফকির ভাত খাচ্ছে, রিকশা মেকানিক রিকশা ঠিক করছে—এগুলো আসলে খুব মজার জিনিস। কীভাবে করে তখন মুখের কী রকম হয়, কী কথা বলে এসব দেখতে যা ভালো লাগে সেটা বলার মতো নয়। গাড়ি থেকে জানালা দিয়ে কথা বলা যায় না কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা খুব সোজা। গত কালকেই আমি মুচির সাথে কথা বলেছি। কীভাবে সে পেরেকগুলো মারে আমাকে আলাদাভাবে দেখিয়েছে! একা একা স্কুলে যাওয়া এবং আসা নিয়ে আম্মু প্রথম প্রথম খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন এখন দুশ্চিন্তা কমেছে।

স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়াও আমি আরো অনেকগুলো কাজ শিখেছি। রান্না করার সময় আমি আজকাল আম্মুর এসিস্টেন্ট। আলু ছিলে দিই, পেঁয়াজ কেটে দিই, চাল ধুয়ে দিই, ডিম ফেটে দিই—ছোট ছোট কাজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের কোন ফ্রিজ নেই কাজেই প্রতি বেলা রান্না করতে হয়। দুই সপ্তাহ আগে কেউ যদি বলতো কোন ফ্রিজ ছাড়া আমাদের থাকতে হবে আমি সেটা বিশ্বাসই করতাম না, কারণ আমার ধারণা ছিল ফ্রিজ ছাড়া থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমি এর মাঝে বুঝে গিয়েছি এটা খুবই সম্ভব, শুধু চিন্তা-ভাবনা করে বাজার করতে হয় আর রান্না করতে হয়।

আমাদের বাসায় এখন কোন টেলিভিশন নাই। সন্ধ্যেবেলা না হয় রাত্রি বেলা টেলিভিশনের সামনে ঘণ্টাখানেক না বসে কিছু না দেখে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে আমার সেটা জানাই ছিল না। এখন আবিষ্কার করেছি এটা খুবই সম্ভব, শুধু যে সম্ভব তাই

না ব্যাপারটা মনে হয় ভালোই। সন্ধ্যেবেলা এখন আমার অফুরন্ত সময়, পড়াশোনা শেষ করে বাড়তি পড়াশোনা করে ফেলতে পারি। আমার ধারণা এখন আমাকে মোটামুটি ভালো ছাত্র হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

যে জিনিসটা সবচেয়ে অবিশ্বাস্য সেটা হচ্ছে টেলিফোন ছাড়া বেঁচে থাকা। এই বাসায় কোন টেলিফোন নেই এবং কখনো আসবে বলে মনে হয় না। কাজেই আমাকে টেলিফোন ছাড়া বেঁচে থাকতে হবে, আমার ধারণা ছিল কাজটি অসম্ভব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাজটি শুধু যে সম্ভব তা নয় মনে হয় একদিক দিয়ে ভালোই। আম্মু যেভাবে সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছেন নিশ্চয়ই যত পরিচিত মানুষ আছে সবাই টেলিফোনে আহা-উহু করতো—দেখা করতে চলে আসতো। এখন টেলিফোন নাই বলে যোগাযোগও করতে পারছে না দেখা করতেও আসতে পারছে না।

এছাড়াও আমি অনেকগুলো কাজ শিখেছি। আমি চোখের পলকে মশারি টানিয়ে ফেলতে পারি, ঘর ঝাঁট দিতে পারি এবং প্যান্ট ইস্ত্রি করতে পারি। শার্ট ইস্ত্রি করাটা একটু কঠিন কিন্তু আমার ধারণা সপ্তাহ দুয়েকের মাঝে শিখে যাব। কেউ কেউ মনে করতে পারে ঘর ঝাঁট দেওয়া বুঝি খুব সোজা—কিন্তু যখন ধুলোগুলো জমা হয় সেটাকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলা অত্যন্ত কঠিন কাজ সেটা কিভাবে করা যায় বের করার জন্যে আমাকে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে। যে কাজটা এখনো আমি ভালো করে করতে শিখিনি সেটা হচ্ছে কাপড় ধোয়া—কী কারণ জানি না এখন পর্যন্ত যতবার কাপড় ধুয়েছি দেখা গেছে কাপড়টা পরিষ্কার না হয়ে আরো কেমন জানি ময়লা হয়ে গেছে। আগে আমার কাবার্ড বোঝাই জামা কাপড় ছিল এখন মাত্র অল্প কয়েকটা, সেগুলোই ঘুরে ফিরে পরতে হয়। ব্যাপারটা আসলে খারাপ না—কোনটা পরব সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না।

আম্মু আমার জন্যে একটা ডেস্ক আর চেয়ার কিনে দিতে চাইছিলেন, আমি রাজি হইনি। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোলের উপর বই রেখে চমৎকার পড়াশোনা করা যায়। লেখালেখি করার জন্যে মেঝেতে উবু হয়ে বসে যাই, অংক করার জন্যে এভাবে মনে হয় বেশি মনোযোগ দেওয়া যায়।

তবে দুটো জিনিস নিয়ে আমার আর আম্মুর খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কম্পিউটারটার জন্যে, যতবারই সেটার কথা মনে হয় বুকের ভেতরে কেমন জানি আকুপাকু করে। আম্মুর কষ্ট হচ্ছে তার সিডি প্লেয়ারের জন্যে, দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে আম্মু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেন নি এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এইভাবে আরো কয়েক দিন চললে আম্মু পাগল হয়ে যাবেন কী না কে জানে। তবে আমি আর আম্মু কেউই অবশ্যি ব্যাপারটা স্বীকার করি না দুই জনেই ভান করি যে দিন বেশ চলে যাচ্ছে!

তবে নতুন স্কুলে আসা মনে হয় আমার জন্যে ভালো হয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়েরাও একটু অন্যরকম। যেমন গত পরশু দিনের ব্যাপারটা, ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে তার মাঝে ছাতা দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে স্কুলে এসে দেখি এখনো কেউ আসে নি। শুধু জানালার কাছে তৃণা বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে এসেছি বুঝতে পারে নি, জানালায় দাঁড়িয়েই রইল এবং আমার মনে হল নিজে নিজে কী যেন বলছে, কান পেতে শুনে মনে হল কবিতা বলছে। একজন মানুষকে একা একা দাঁড়িয়ে ঝমঝমে বৃষ্টির দিকে

তাকিয়ে আপন মনে কবিতা বলতে আমি কখনো দেখি নি। কিন্তু ব্যাপারটা এতো মানিয়ে গেছে যে আমি তাকে ডিস্টার্ব না করে চুপচাপ বসে রইলাম। তৃণা হঠাৎ কী মনে করে পেছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "তুই চুপচাপ বসে আছিস কিন্তু কিছু বলছিস না কেন? কখন এসেছিস?"

"এই তো এক্ষুণি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বলছিলি?"

"কিছু না।"

"বল না।"

তৃণা লজ্জায় লায় হয়ে বলল, "রূপসী বাংলার কবিতাগুলো মুখস্থ করছিলাম তো—তাই।"

রূপসী বাংলা কী জিনিস আমার জানা নেই, লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেলব কী না ভাবছিলাম তখন তৃণা নিজেই বলল, "জীবনানন্দের এই কবিতাগুলো আমার এতো ভালো লাগে যে ঠিক করেছি সবগুলো মুখস্থ করে ফেলব।"

"কতগুলো?"

"সব মিলিয়ে একষট্টিটা।"

আমি অবাক হয়ে তৃণার দিকে তাকিয়ে রইলাম, একজন কবির কবিতা ভালো লাগে বলে একজন মানুষ তার কবিতার বইয়ের সবগুলো কবিতা মুখস্থ করে ফেলতে পারে এই ব্যাপারটিই আমার চিন্তার বাইরে ছিল। কিন্তু ঝমঝমে বৃষ্টির মাঝে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়ে নিজের মনে যখন কবিতাগুলো বলতে থাকে তখন সেটা এতো চমৎকারভাবে মানিয়ে যায় যে মনে হয় এটাই স্বাভাবিক এটাই তো আসলে হাওয়ার কথা। কী আশ্চর্য! আমার মনে হল আমিও যদি এরকম অনেকগুলো কবিতা মুখস্থ করে ফেলতাম কী চমৎকার হতো!

এরকম ছোটখাটো অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো আমি জানতম না। ছেলে-মেয়েরা কয়েকটা বাংলা ব্যান্ডের জন্যে পাগল। কিছু লেখক আছে তাদের বই কাড়াকাড়ি করে পড়ে। কিছু গায়ক, কিছু শিল্পী আছে আমি যাদের নামও জানতাম না। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও তাদের ভেতরে একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে এর সাথে সম্পর্ক আছে এরকম মানুষজন নিয়ে তারা কথা বলে। রাজনীতিরও অনেক কিছু বুঝে যেটা আমি ভাবতাম শুধু বড় মানুষেরাই বুঝি বুঝতে পারে। এক কথায় বলে দেয়া যায় আগে আমি আলাদা একটা ছোট জগতে ছিলাম এখন মনে হয় বড় একটা জগতে এসেছি। যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি এই বড় জগতটাই আসল জগত। এর সবকিছু যে ভালো তা না কিন্তু সবকিছু খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই।

এর মাঝে একদিন একটা মহা কেলেংকারী হয়ে যাবার উপক্রম হল। আমি স্কুলে এসে দেখি একজন একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকা নিয়ে এসেছে। সেখানে একজন ব্যান্ড গায়কের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার খবর ছাপা হয়েছে। সবাই যখন হুমড়ি খেয়ে খবরটা পড়ছে তখন হঠাৎ করে আমার পেছনের পাতায় চোখ পড়ল এবং সাথে সাথে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল। সেখানে আব্বুর একটা বড় ছবি তার নিচে আমার আর আম্মুর ছোট ছোট ছবি এবং বড় বড় করে লেখা, "আলতাফ নবীর স্ত্রী পুত্র : কোথায় আছে? কেমন আছে?"

আমি এখানে কাউকে বলি নি আমি আলতাফ নবীর ছেলে, কেউ জানতেও চায় নি। যদি এখন জেনে যায় তাহলে মহাঝামেলা শুরু হয়ে যাবে—কেন আম্মু চলে এসেছে, কী হয়েছে, আমরা এখন কেমন করে থাকি, কেমন করে চলে এই রকম হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমাকে কাজল হিসেবে মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছে, আলতাফ নবীর ছেলে হিসেবে মেনে নেবে কী না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি, তার মাঝে সবাই ব্যান্ড গায়কের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার খবরটা খুঁটিনাটিসহ পড়ে শেষ করলো এবং সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। "আলতাফ নবীর স্ত্রী-পুত্র কোথায় আছে? কেমন আছে?" এতো বড় হেডিং থাকার পরও মনে হল সেটাতে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না কিন্তু হঠাৎ করে সেটা কিংশুকের চোখে পড়ল এবং মনোযোগ দিয়ে খরবটা পড়ে সে বলল, "দেখেছিস আলতাফ নবী কী করেছে?"

তৃণা জিজ্ঞেস করল, "কী করেছে?"

"বউ বাচ্চাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।"

"দেখি—" বলে তৃণা ট্যাবলয়েডটা হাতে নিল, আমাদের ছবিটা দেখে বলল, "আহা রে!"

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি, এতোগুলো মানুষ খবরের কাগজে ছবিটা দেখেও আমাকে চিনতে পারছে না? ছবিটা অবশ্যি এক বছরের পুরনো এর মাঝে আমি অনেক বড় হয়েছি—কিন্তু তবুও তো আমার ছবি। শারমিন আমার ছবিটা দেখে বলল, "ছেলেটা কী কিউট!"

তৃণা বলল, "হ্যাঁ, এইটুকুন ছেলেকে বের করে দিয়েছে।"

আমার মনে হল একবার বলি যে এইটুকুন ছেলে না বড় ছেলে, আর বের করে দেয়নি বের হয়ে এসেছে।

কিংশুক বলল, "আমি বড় লোকদের বুঝতে পারি না।"

খালেদ বলল, "কী বুঝতে পারিস না?"

"এতো টাকা দিয়ে কী করে?"

"এতো না বোঝার কী আছে? টাকা ইনভেস্ট করে, ইন্ড্রাস্ট্রি করে।"

"গরিব মানুষকে টাকা দিয়ে দেয় না কেন?"

"কেন দেবে? কষ্ট করে টাকাটা উপার্জন করেছে। দিয়ে দেবে কেন?"

তৃণা তখনও ট্যাবলয়েডে আমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ছেলেটাকে কোথায় জানি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!"

কিংশুক হি হি করে হেসে বলল, "আলতাফ নবীর ছেলেকে তুই কোথায় দেখলি?"

"না, না, আসলেই চেনা মনে হচ্ছে।"

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম এবং কপাল ভালো এবারেও ব্যাপারটা কারো মাথায় ক্লিক করলো না। শারমিন বললো, "এই ছেলেটা আর তার মা এখন কোথায় আছে কে জানে!"

কিংশুক বলল, "আরে ধুর! বড় লোকের কোনো সমস্যা হয় না। খোঁজ নিয়ে দেখ এখন হয়তো আমেরিকা চলে গেছে। এদের কী আর আমাদের মতো অবস্থা? দুনিয়ার সব জায়গায় এদের বাড়িঘর থাকে।"

তৃণা বলল, "তা ঠিক। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এই ছেলেটাকে আমি দেখেছি। নিশ্চয়ই দেখেছি।"

আর এক সেকেন্ড হলেই তৃণা মনে হয় ধরে ফেলতো। কিন্তু ঠিক তখন ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় আমি বেঁচে গেলাম।

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাকে নিজেদের মানুষ বলে মনে করছে কী না সেটা নিয়ে আমার খুব সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখতে পেলাম খালেদ দুই চোখে দেখতে না পারলেও অন্যেরা আমাকে পছন্দই করছে। ছেলেমেয়েরা সবাই আমার থেকে চালাক-চতুর—আমি মনে হয় তাদের তুলনায় একটু বোকাসোকাই। অনেক কিছু সবাই জানে যেটা আমি জানি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হয় এবং এরকম সাধারণ জিনিস আমি জানি না দেখে সবাই মনে হয় এক ধরনের মজা পায়। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাকে নিজেদের মানুষ বলে মনে করছে সেটা বুঝতে পারলাম যেদিন তৃণা তার জন্মদিনে আমাকে দাওয়াত করলো। ক্লাসের সবাইকে সে ডাকেনি অল্প কয়েক জনকে ডেকেছে তার মাঝে আমি একজন, আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে খুশি হলাম কারণ এটা তৃণার জন্মদিন, এই মেয়েটাকে যতই দেখছি আমি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। একজন মানুষ কোন কারণ ছাড়া শুধু ভালো লাগে বলে একটা আস্ত কবিতার বই মুখস্থ করে ফেলছে, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

তৃণার জন্মদিনে কী উপহার দেওয়া যায় সেটি নিয়ে আমাকে আম্মুর সাথে পরামর্শ করতে হল। মেয়েরা কী উপহার পছন্দ করে সেটা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তৃণা বইয়ের পোকা তাকে বই দিলে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে কিন্তু কোন বই সে পছন্দ করে আমি জানি না। আম্মু ভাবনা-চিন্তা করে একটা সুন্দর পেন্সিল হোল্ডার কিনে দিলেন—পেন্সিল হোল্ডার সবসময়েই ব্যবহার করা যায়।

আমি যখন তৃণার বাসায় পৌঁছেছি তখনও সবাই আসেনি। দরজা খুলে তৃণা খুশি খুশি গলায় বলল, "কাজল, এসেছিস?"

"হ্যাঁ।" আমি পেন্সিল হোল্ডারটা তৃণার হাতে দিয়ে বললাম, "দ্যাখ এটা পছন্দ না হলে তুই কিন্তু আমাকে কিছু বলতে পারবি না।"

"কেন?"

"আমার আম্মু কিনে দিয়েছে!"

"ইস! তোর আম্মু। একেবারে নায়িকার মতো দেখতে! এতো সুন্দর চেহারা। তোর থেকে তোর আম্মুর রুচি একশগুণ ভালো হবে!"

আমার আম্মুর চেহারা নায়িকার মতো তাই তার রুচি আমার থেকে একশগুণ ভালো হবে—এটা কোন যুক্তি হতে পারে না, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে তর্ক করলাম না। তৃণা বলল, "আয় ভেতরে আয়।"

আমি আর আম্মু এখন ছোট এক চিলতে বাসায় থাকি, তা না হলে আমার নিশ্চয়ই তৃণাদের বাসাটাকে ছোট মনে হতো। রান্না ঘরের পাশে একটা ছোট ডাইনিং টেবিল, একজন ভদ্রমহিলা সেখানে খাবার-দাবার রাখছেন। তৃণা বলল, "আম্মু, এই যে কাজল।"

তৃণার আম্মা হালকা পাতলা হাসি-খুশি, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসো বাবা। তৃণা বলেছে তুমি স্কুলে নতুন এসেছ।"

"জী খালাম্মা।"

"এর আগে তুমি কোন স্কুলে ছিলে?"

আমি স্কুলের নাম বলতেই তৃণার আম্মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন না। কী মনে করে হঠাৎ মুখ টিপে একটু হাসলেন, তারপর বললেন, "তোমার নাম যেন কী?"

"কাজল।"

"ভালো নাম?"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তৃণার আম্মার হঠাৎ করে আমার ভালো নাম জানার কৌতূহল হল কেন? আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "ফাওয়াজ নবী।"

নামটি দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার বলার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম কিন্তু তৃণার আম্মা একবারেই নামটা ধরে ফেললেন, বললেন, "ফাওয়াজ?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের অফিসে একজন ছিল তার নাম ফাওয়াজ। সুন্দর নাম।"

আমি হাঁ করে তৃণার আম্মার দিকে তাকিয়ে রইলাম—এই প্রথম একজন একবারে নামটি ঠিক করে উচ্চারণ করতে পেরেছে এবং বলেছে নামটি সুন্দর!

তৃণাদের বসার ঘরে আমাদের ক্লাসের আরো কয়েকজন এসেছে, আমাকে দেখে তারা খুশি হওয়ার মতো একটা শব্দ করল। কিংশুক ক্রিকেট খেলা নিয়ে কথা বলছে, খালেদ এখনো আসে নি। সে এলে কথাবার্তা পড়াশোনার দিকে মোড় নেবে। সুমি আর লাবণী ঘরের এক কোনায় কিছু একটা নিয়ে উত্তেজিত গলায় কথা বলছে। ঘরে আরো কয়েকজন অপরিচিত ছেলেমেয়ে আছে—এরা তৃণার বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন। আমি কিংশুকের ধারে কাছে থাকলাম, আগেও লক্ষ্য করেছি, যে কোন জায়গায় কিংশুক একটানা কথা বলে যেতে পারে, অন্যদের কিছু করতে হয় না।

খালেদ এসে আমাকে দেখেই ভুরু কুঁচকালো—সে আমাকে এখানে আশা করেনি, বলল, "তু-তুমিও এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"মানে-ইয়ে তৃণা তোমাকে আসতে বলেছে?"

আমার এতো মেজাজ খারাপ হল যে বলার মতো নয়, কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, "না আমাকে আসতে বলেনি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম খাবারের গন্ধ পেয়ে ঢুকে গেছি।"

খালেদ আর কোন কথা না বলে মুখ কালো করে চলে গেল। আমার ওপর যে রেগে গেছে সেটা বোঝা গেল একটু পরে, বেশ কয়েক জনের সামনে আমাকে ডাকলো, "ফাওয়াজ—"

সবাই সব সময়েই আমাকে কাজল বলে ডাকে, ফাওয়াজ নামটা কাগজপত্রের জন্যেই, সবকিছু জেনে শুনেই খালেদ আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, "কী?"

"ফাওয়াজ কথাটার মানে যেন কী?"

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "ফাঁকা আওয়াজ।"

খালেদ আবার থতমত খেয়ে গেল। কাছাকাছি একজন বয়স্ক মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন এত সুন্দর নামটা নিয়ে ঠাট্টা করছ? ফাওয়াজ—কি চমৎকার নাম!"

একই দিনে দ্বিতীয়বার হল যে একজন একবারে আমার নামটা সঠিক উচ্চারণ করল এবং বলল নামটা সুন্দর। কী আশ্চর্য!

শুধু যে দ্বিতীয়বার হল তা নয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বার আমার নামটা উঠে এলো এবং বড়দের মাঝে কেউ না কেউ একবারে সঠিকভাবে নামটা উচ্চারণ করে বলল নামটি সুন্দর, তখন হঠাৎ করে আমার একটা সন্দেহ হতে থাকে। মনে হতে থাকে ব্যাপারটি বুঝি সাজানো।

তৃণার জন্মদিনের পার্টি শেষ করে আমি যখন চলে যাচ্ছি তখন তৃণাকে ডেকে বললাম, "তৃণা শোন।"

"বল।"

"তুই আজকে কিছু একটা করেছিস, তাই না?"

"কী করেছি?"

"আমার নাম নিয়ে?"

তৃণা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর অপরাধীর মতো হেসে ফেলল, বলল, "তুই ধরে ফেলেছিস?"

"এটা ধরে ফেলা কঠিন? গত তেরো বৎসর কেউ এই নামটা উচ্চারণ করতে পারে নাই—আজ একদিনে সবাই নামটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করে আহা-উহ করছে, সন্দেহ হবে না?"

"তুই রাগ করেছিস?"

আমি বললাম, "না করি নাই।"

"সেদিন তুই বললি কেউ তোর নাম ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। সেটা নিয়ে তোর মনে এতো দুঃখ তাই ভাবলাম—" তৃণা বলল, "সত্যি রাগ করিস নি তো?"

"না রাগ করব কেন?"

"সবাইকে নামটা শিখিয়ে দিয়ে বলেছি নামটার প্রশংসা করতে!"

"সেটা দেখেছি।"

তৃণা বলল, "তোর মনটা ভালো করতে গিয়ে তোকে আরো রাগিয়ে দিলাম নাকি?"

"না দিস নি।" আমি বললাম, আমি এতো সহজে রাগি না। গেলাম। কাল স্কুলে দেখা হবে।"

"ঠিক আছে। খোদা হাফেজ।"

"খোদা হাফেজ।"

বাসায় আসতে আসতে পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমি আপন মনে হাসলাম। তৃণা মেয়েটার মনে হয় আসলেই একটু মাথা খারাপ কিন্তু কী চমৎকারভাবে মাথা খারাপ!

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেছে। এই এক মাসের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, প্রথমটি হচ্ছে আম্মু একটা চাকরি পেয়েছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে আমি শার্ট ইস্ত্রি করা শিখে গিয়েছি। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে ঘটবে করছে, আমি আর আম্মু মিলে টাকা জমাচ্ছি, গান শোনার জন্যে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কেনা হবে। ইচ্ছে করলে এখনই কেনা যায় কিন্তু আম্মু ইচ্ছে করে কিনছেন না, নিজের বেতনের টাকা পেয়ে কিনবেন। আমি আর আম্মু সময়

পেলে ইলেকট্রনিক্সের দোকান ঘুরে ঘুরে কোনটা কেনা যায় সেটা নিয়ে আলাপ–আলোচনা করি।

স্কুলের মাঝেও এখন উত্তেজনা চলছে। এক মাস পরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, সেই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আমাদের ক্লাস থেকে সেখানে নাটক করা হবে—এর আগে কখনো নাটক করা হয়নি, এবারেই প্রথম। উৎসাহ বেশি আমাদের জালাল স্যারের, এমনিতে আমাদের বিজ্ঞান পড়ান কিন্তু নাটকে ভীষণ উৎসাহ। প্রথমে খুব হৈচৈ করে একটা নাটক বেছে নেওয়া হল—আমি বাংলা বইপত্র একেবারেই পড়ি নাই বলে জানি না কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হল খুব জনপ্রিয় একজন লেখকের ফাটাফাটি একটা নাটক। সবাই গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে লাগল যে নাটকটি নাকি খুব কঠিন, চরিত্রগুলো দুরূহ। আমি আগে কখনো কাউকে নাটক করতে দেখিনি তাই সেটা কঠিন কিংবা দুরূহ কিভাবে হয় বুঝতে পারলাম না। একদিন স্কুল ছুটির পর জালাল স্যার নাটকের 'চরিত্র নির্বাচন' করতে বসলেন। ক্লাসের প্রায় সবাই এখানে আছে। প্রথমে স্যার বিশাল একটা লেকচার দিলেন, সেখানে বললেন, নাটকে অভিনয় করাটাই বড় কথা না, আর অভিনয় করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করাটাই বড় কথা না, ভূমিকাটা যতো ছোটই হোক সেটাই ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা! কাজেই যাকে যে ভূমিকা দেয়া হবে তাকেই সেটাতে অভিনয় করতে হবে।

এর মাঝেই নাটকটি স্যার ক্লাসে পড়ে শুনিয়েছেন কাজেই কী কী চরিত্র আছে সবাই জানে। নায়কের নাম রাশেদ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নায়িকার নাম কুসুম। এছাড়াও আছে নায়িকার মা রাহেলা, গাল কাটা বদর নামে একজন সন্ত্রাসী। স্কুল মাস্টার আজিজ। তার স্ত্রী আর একজন পুলিশ অফিসার। এছাড়াও নাম নেই এরকম গ্রামবাসীর চরিত্র আছে যারা মাঝে মাঝে স্টেজে এসে হৈচৈ করবে।

প্রথমে মেয়ে চরিত্রগুলো ঠিক করে নেয়া হল—ক্লাসের মেয়েরা এ ব্যাপারে খুব ভালো। কেউই নায়িকার চরিত্রের জন্যে মারামারি করল না বরং একজন আরেকজনকে সেটা করার ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ক্লাসে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর শারমিন কাজেই তাকে নায়িকা কুসুমের ভূমিকাটি দেয়া হল, দেখা গেল তাতে কারোই আপত্তি নেই। তৃণা পেলো কুসুমের মায়ের ভূমিকা। স্কুল মাস্টার আজিজের স্ত্রীর ভূমিকা পেলো নন্দিতা নামের একজন মেয়ে।

ছেলেদের ভূমিকা দেবার সময় দেখা গেলো সবারই সখ নায়কের ভূমিকার জন্যে, কাজেই জালাল স্যারকে অডিশন নিতে হল। নাটকে একটা অংশ পড়ে শোনানো হল আর এক–একজন সেটা অভিনয় করে দেখাল। প্রথমে খালেদ, তারপর ইফতি, তারপর কিংশুক তারপর নজরুল নামে একজন ছেলে। তৃণা আমাকে বলল, "তুই করবি না?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "মাথা খারাপ?"

"কেন?"

"আমি জীবনে স্টেজে উঠি নাই। চিন্তা করলেই আমার পা কাঁপে!

নাটকের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদেরকে ডায়লগ বলা হল আর তারা সেটা অভিনয় করে দেখলো। আমার মনে হল সবচেয়ে ভালো করেছে ইফতি, কিন্তু স্যার কিংশুককে বেছে নিলেন। ইফতি পেলো সন্ত্রাসীর ভূমিকা, জালাল স্যার বারবার বলতে লাগলেন, "সন্ত্রাসী বলে তাচ্ছিল্য করবি না—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।"

www.MurchOna.com

খালেদ পেলো স্কুল মাস্টার আজিজের ভূমিকা এবং সে খুব মন খারাপ করে মুখ গোঁজ করে বসে রইল কিন্তু আমাদের সবার মনে হল ঠিকই হয়েছে। তার চেহারাটা মোটেও নায়কের মতো না বা সন্ত্রাসীর মতো না—বরং চশমা দেখে তাকে স্কুল মাস্টারের মতোই দেখায়। পুলিশ অফিসারের চরিত্রটি পেলো নজরুল, অন্য সবাই গ্রামবাসী।

চরিত্র নির্বাচনের পরপরই নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল—প্রথম প্রথম দেখা গেল কারো গলা দিয়েই শব্দ বের হয় না, আর যদিও বা বের হয় সেটায় জোর নেই। মেয়েদের মনে নিশ্চয়ই বেশি আনন্দ কারণ তারা একটা ডায়ালগ বলেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করে। হাসি খুব সংক্রামক জিনিস মেয়েদের দেখাদেখি ছেলেরা এবং উপস্থিত দর্শকেরা এবং শেষ পর্যন্ত জালাল স্যারও হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতেই বললেন "খবরদার কেউ হাসবি না, হাসলে মাথা ভেঙ্গে ফেলব।"

প্রথমদিন রিহার্সাল নিয়ে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া গেল না, স্যার খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করে ছেড়ে দিলেন। ঠিক করা হল নাটকের স্ক্রিপ্ট ফটোকপি করে সবাইকে দেওয়া হবে এবং সবাইকে তাদের পার্ট মুখস্থ করে ফেলতে হবে।

কয়েক দিনের মাঝেই নাটকের রিহার্সাল খুব জমে উঠল। আমার কোন কাজ নেই তাই প্রত্যেক দিন বসে বসে রিহার্সাল দেখি। কাহিনীটা খুব ভালো, রাশেদ নামের একজন আধপাগল ছেলে কিভাবে একটা গ্রামের নেতৃত্ব নিয়ে অত্যাচারী সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তার গল্প। যে নাটকটা লিখেছে সে নিশ্চয়ই খুব ভালো লিখতে পারে, কারণ ডায়ালগগুলো খুব সহজ আর মজার। মাঝে মাঝেই নাটকীয় ঘটনা থাকে—দুটো মারপিটের সিন আছে, প্রথমটায় মার খায় নায়ক পরেরটায় সন্ত্রাসী। জারী গানের একটা দৃশ্য আছে যেখানে নায়ক রাশেদ মাথায় গামছা বেঁধে হাত তালি দিয়ে নেচে নেচে গান গায় আর সবাই তখন সেখানে তাল দিতে থাকে! নায়িকার সাথে কয়েকটা দৃশ্য খুব সুন্দর, কয়েকটা সাধারণ কথা কিন্তু সেগুলো শুনলেই চোখে পানি চলে আসে। ঠিকভাবে অভিনয় করতে পারলে যা চমৎকার একটা নাটক হবে সেটা আর বলার মতো নয়। আমাদের সবারই খুব উৎসাহ, এমন কী স্কুল মাস্টার আজিজের ভূমিকা পাওয়ার দুঃখটাও খালেদ ভুলে গিয়ে একেবারে মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় করছে। বসে বসে রিহার্সাল দেখতে দেখতে পুরো নাটকের প্রায় সব ডায়ালগই আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

একদিন বিকেলে রিহার্সাল হচ্ছে, জালাল স্যার স্ক্রিপ্ট নিয়ে প্রম্পট করছেন এবং সবাই অভিনয় করছে তখন স্কুলের দপ্তরি মিন্নাত আলী এসে স্যারকে বলল, তার ফোন এসেছে। স্যার আমাকে হাতের কাছে পেয়ে স্ক্রিপ্টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নে তুই প্রম্পট কর আমি আসছি।"

আমি একটা কাজ পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠলাম, এক কোনায় দাঁড়িয়ে প্রম্পট করতে শুরু করলাম। ইংরেজি মিডিয়াম থেকে এসেছি বলে কঠিন কঠিন শব্দ হলে বাংলা পড়তে একটু অসুবিধে হয় কিন্তু এখানে কোন কঠিন শব্দ নেই, খুব সহজ করে লেখা। আমার কোন অসুবিধেই হল না তার ওপর এতবার রিহার্সাল দেখেছি যে আমার নাটকটা প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে।

টেলিফোন শেষ করে স্যার ফিরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে অভিনয় শুধরে দিতে লাগলেন, আমি প্রম্পট করে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ

পর স্যার বললেন, "তুই তো ভালো প্রম্পট করিস দেখি। করতে থাক—আমার কাজে একটু সাহায্য হয়।"

আমি খুব খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। স্যারের খুব সাহায্য হল—কারণ স্যার হাজির না থাকলেও আমি কাজ চালিয়ে যেতে পারি। শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে কোথায় কী করতে হবে সেটা সবাইকে মনেও করিয়ে দিতে পারি। সপ্তাহ খানেকের মাঝে আমি কোন অভিনয় না করেও নাটকের পুরো টিমের একজন হয়ে গেলাম। অন্য সবাই নাটকে তার অংশটা জানে, আমি জানি সবার সব অংশ।

আস্তে আস্তে নাটকের দিন এগিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজনায় আমাদের কারো ঘুম নেই। কে কী পোশাক পরবে ঠিক করা হয়েছে, বিভিন্ন সিনে সেই পোশাকের পরিবর্তন হবে সেটাও ঠিক করা হয়েছে। নাটকের বিভিন্ন জায়গায় মিউজিক দেয়ার জন্যে অনেক জায়গা থেকে সেগুলো জড়ো করে একটা ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয়েছে। সামনের দিন থেকে মিউজিকসহ রিহার্সাল করা হবে। শেষ তিনদিন রিহার্সাল করা হবে আসল স্টেজে। জালাল স্যার একেবারে সব কিছু নিখুঁতভাবে ভেবে রেখেছেন কোথাও কোন ফাক-ফোঁকর নেই। আমি এর মাঝে স্যারের অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে গেছি। স্যার ক্লাস থেকে আরো কয়েক জনকে নিলেন, তারা বিভিন্ন সিনে স্টেজে জিনিসপত্র আনা নেয়া করবে।

যারা অভিনয় করছে তারা এর মাঝে অভিনেতা অভিনেতা ভাব দেখাতে শুরু করেছে। কিংশুকের ভাব দেখে মনে হয় সে বুঝি টম ক্রুজ। নাটক শেষ হবার পর সবচেয়ে অসুবিধে হবে ইফতির, সবাই তাকে গাল কাটা বদর বলে ডাকবে, সে ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ নেই। তৃণা খুব দুশ্চিন্তায় আছে যে নাটকের শেষে স্কুলের সব ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই তাকে খালাম্মা বলে ডাকবে। সে এতো সুন্দর করে বয়স্কা মহিলার অভিনয় করছে যে যখন তার চুলে সাদা রং দিয়ে একটা সাদা শাড়ি পরিয়ে স্টেজে নামানো হবে তখন তাকে তৃণা হিসেবে চেনাই যাবে না। জালাল স্যার খুঁজে খুঁজে জয়ন্ত অধিকারী নামে একজন মেকআপ ম্যান বের করেছেন তার মতো ভালো মেকআপ ম্যান নাকি বাংলাদেশে নেই। লাইটিং দেয়ার জন্যেও কিছু মানুষ আসছে, কখন স্পট লাইট কখনও ফ্লাড এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমরা সেগুলো বুঝি না বলে নাটকের দিনের জন্যে অপেক্ষা করছি।

স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও হতে থাকে। ছেলেমেয়েদের বাবা-মা'দের কার্ড দেওয়া হয়েছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট আসবেন, প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। আম্মু কোথাও যেতে চান না তাকেও আসতে রাজি করিয়েছি আমাদের এতো সুন্দর নাটকটা দেখবেন না এটা তো হতে পারে না।

নাটকের আগের দিন স্টেজ রিহার্সেলে কিংশুককে কেমন যেন চুপচাপ দেখা গেল, সে দরকার না হলে বেশি কথা বলছে না। এমনিতে তার কথার জন্যে কেউ থাকতে পারে না, সে এই নাটকের নায়ক কথাটা সে কাউকে এক সেকেন্ডের জন্যে ভুলতে দেয় না। আমি কিংশুককে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল তুই এতো চুপচাপ কেন?"

"না, কিছু না। একটু পেট ব্যথা করছে।"

"পেট ব্যথা করছে? কেন?"

কিংশুক শুকনো মুখে বলল, "দুপুরে একটা হ্যামবার্গার খেয়েছি সেটা মনে হয় বাসী ছিল। সেই থেকে পেটে ব্যথা।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "বেশি ব্যথা নাকি?"

"না, না বেশি না। একটু চিনচিনে ব্যথা, ডান দিকে।"

আমি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, শরীরটা একটু গরম মনে হল। বললাম, "জ্বর উঠেছে নাকি?"

"না। জ্বর উঠে নাই।"

"দেখিস, আজকে আর জ্বর বাধাস নে।"

কিংশুক হাসল, বলল, "বাধাব না। চিন্তা করিস না।"

আজকে লাইট দিয়ে স্টেজ রিহার্সেল হবে, যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা একটু পর পর রিহার্সেল থামিয়ে লাইট ঠিক করতে লাগল, স্পট লাইট সরাতে লাগলো। কাজেই কিছুতেই নাটক নিয়ে আগানো যাচ্ছে না। এতো বারবার থামালে অভিনয় করা যায় না, তাই সবাই একটু বিরক্ত হয়ে উঠল। মারামারির দৃশ্যটাতে কিংশুক অন্য দিনের মতো ছোটাছুটি না করে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে গেল। জালাল স্যার বুঝতে পেরে সবাইকে আজকের মতো ছেড়ে দিলেন। ঠিক থাকলো পরদিন সকাল সাড়ে নয়টায় সবাই আসবে, একটা রিহার্সাল দিয়ে আড়াইটার সময় আসল নাটক মঞ্চস্থ করা হবে।

আমি সকাল নয়টার সময় চলে এসেছি, স্টেজে গিয়ে দেখি সেখানে জালাল স্যার চুপচাপ বসে আছেন। জালাল স্যার কখনো চুপচাপ বসে থাকেন না, সব সময়ই কিছু না কিছু করছেন। তাই তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমি একটু অবাক হলাম। স্যার আমাকে দেখে দুর্বল গলায় বললেন, "এসেছিস?"

"জী স্যার।"

স্যার কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন এবং স্যারের হাসি দেখেই মনে হল কিছু একটা হয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে স্যার?"

স্যার এমনভাবে হাসলেন যে মনে হল স্যার কাঁদছেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কিংশুকের এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছে।"

আমার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কী বলেছেন বুঝতে পেরেও আবার বললাম, "কী হয়েছে স্যার?"

"এপেন্ডিসাইটিস অপারেশান। পেটের মাঝে এপেনডিক্স বলে একটা জিনিস থাকে মাঝে মাঝে সেটা ইনফেকশন হয়ে যায়, তখন সেটা অপারেশন করে ফেলে দিতে হয়।"

আমার মনে পড়ল গতকাল বিকেলে সে চুপচাপ বসেছিল, বলেছিল পেট ব্যথা। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলাম মনে হয়েছিল একটু জ্বরও ছিল। স্যার বললেন, "কিংশুক জানে বেঁচে গিয়েছে। পেটের ভেতরে এপেনডিক্স বার্স্ট করে গিয়েছিল, খুব ডেঞ্জারাস তখন। মানুষ মরে যায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের নাটকের কী হবে স্যার?"

স্যার কষ্ট করে হাসলেন, "কিংশুক ছাড়া নাটক কেমন করে হবে? রাত্রে সার্জারি হয়েছে। ফোন করেছিলাম একটু আগে জ্ঞান এসেছে।"

আমি ঠিকভাবে চিন্তাও করতে পারছিলাম না, প্রায় এক মাস থেকে এতোজন মানুষ মিলে এই নাটকটা দাঁড়া করিয়েছি, এতো উৎসাহ এতো পরিশ্রম করে শেষ মুহূর্তে আমরা

নাটকটা করতে পারব না? আমি আমাদের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, মানুষের কেমন করে এরকম খারাপ ভাগ্য হতে পারে? আমরা কী এমন অন্যায় করেছি যে খোদা আমাদের এরকম একটা শাস্তি দিলেন?

আস্তে আস্তে অন্যেরা আসতে শুরু করেছে এবং কিংশুকের খবর শুনে একেকজন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তৃণা কাঁদতে শুরু করল। অন্যেরা কাঁদল না কিন্তু দেখে মনে হল যে কাঁদলেই মনে হয় ভালো ছিল। ইফতি জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব?"

স্যার বললেন, "তোমরা এখন বড় হয়েছ, তোমাদের কিছু জিনিস শিখতে হবে। জীবনে এরকম অনেক আঘাত আসবে, দুঃখ আসবে। আশাভঙ্গ হবে এর মাঝে বেঁচে থাকা শিখতে হবে। আমরা এখন এই আশা ভঙ্গের দুঃখ মেনে নেব। আমরা খোদার কাছে শোকর করব যে কিংশুকের কিছু হয় নাই, সে বেঁচে গিয়েছে। কিংশুকের বেঁচে যাওয়ার আনন্দ দিয়ে আমরা আমাদের দুঃখ মুছে ফেলব।"

স্যার বললেন খুব সুন্দর করে, কিন্তু শুনেও আমাদের মনের কারো দুঃখ এতটুকু মুছে গেল না। ইফতি ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমাদের নাটক হবে না?"

"কেমন করে হবে?" স্যার সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে বললেন "আমরা সামনের বছর আবার করব। কী বলিস?"

কেউ কোন কথা বলল না। স্যার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে স্টেজের দিকে তাকালেন, সবকিছু একেবারে রেডি করে রাখা আছে কিন্তু নাটকটি হবে না, এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। স্যার স্টেজে বসেছিলেন, এবারে নিচে নেমে বললেন, "আমি একটু হাসপাতালে যাই, কিংশুককে দেখে আসি।"

আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি বললাম, "স্যার, আমিও আসি?"

"যাবি? আয়। দেখতে দিবে কী না জানি না।"

অন্যেরা বলল, "স্যার আমরাও আসি?"

আয় তাহলে। একটা মাইক্রোবাস আছে। গাদাগাদি করে চলে যাব।

মাইক্রোবাস করে আমরা সবাই যাচ্ছি, কেউ একটা কথাও বলছে না। দেখে মনে হতে পারে কেউ বুঝি মারা গেছে। আসলেই তো মারা গেছে, আমাদের সবার একটা স্বপ্ন মারা গেছে।

আমি কখনো হাসপাতালে যাই নি। টেলিভিশনে মাঝে মাঝে হাসপাতালের ছবি দেখেছি, ঝকঝক তকতক করছে, সবুজ রংয়ের ল্যাবকোট পরে ডাক্তাররা ছোটাছুটি করছে, তাই আসল হাসপাতাল দেখে আমার আক্কেল গুরুম হয়ে গেল। হাসপাতালটি নোংরা এবং মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে। দেয়ালে পানের পিক এবং কোনায় কোনায় জঞ্জাল। ভালো মানুষই তো এখানে অসুস্থ হয়ে যাবে রোগীরা ভালো হবে কী ভাবে?

আমরা জালাল স্যারের পিছু পিছু দোতালায় এলাম, সেখানে স্যার খোঁজাখুঁজি করে একটা ওয়ার্ড বের করলেন এবং তার বাইরে কিংশুকের বাবার সাথে দেখা হল। ভদ্রলোকের মাথার চুল এলোমেলো, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি এবং চোখের নিচে কালি। জালাল স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছে কিংশুক?"

"এখন ভালো। একটু আগে বলেছে বিপদ কেটে গেছে।"

স্যার বললেন, "শোকর আলহামদুলিল্লাহ।"

"ডাক্তার বলেছে বেশ কয়েক দিন থেকেই ইনফ্লেম করেছে। নাটকের উৎসাহে কাউকে কিছু বলে নাই।" কিংশুকের আব্বা জালাল স্যারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের সবাইকে দেখে বললেন, "এরা নাটকের ক্রু?"

জালার স্যার মাথা নাড়লেন।

"এদের নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ?"

স্যার আবার মাথা নাড়লেন।

"হতেই পারে।" কিংশুকের আব্বা বললেন, "যখন অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছে তখনও ছেলেটা ডাক্তারকে বলছে কোন একটা ওষুধ দিয়ে তাকে আর একদিন মাত্র সময় দিতে। কী মন খারাপ আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

স্যার বললেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারি। সবাই মিলে এমন চমৎকার একটা টিম হয়েছিল যে সেটা বলার মতো নয়।"

কিংশুকের আব্বা বললেন, "আপনি একটু দেখে আসেন, খুব মন খারাপ, একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসেন।"

তৃণা বলল, "স্যার, আমরা দেখতে যেতে পারব না?"

"দাঁড়া আগে আমি দেখে আসি।"

কিংশুকের আব্বা জালাল স্যারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন, আমরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম, এতো মন খারাপ লাগছে যে বলার মতো নয়। কিংশুক এরকম একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে জানার পরও পুরো রাগটা গিয়ে পড়েছে তার ওপর। আর একটা দিন পর হলে কী হতো? একটা মাত্র দিন!

একটু পর জালাল স্যার বের হয় এসে বললেন, "ডাক্তার বলেছেন তোরা দেখতে যেতে পারিস কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারবি না। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসবি। ঠিক আছে?"

আমরা মাথা নাড়লাম।

"আয় তাহলে আমার সাথে।"

আমরা জালাল স্যারের পিছু পিছু ভেতরে গেলাম। সাড়ি সাড়ি অনেকগুলো বিছানা, প্রত্যেকটাতে একজন করে শুয়ে আছে, পাশে আই. ভি. এর বোতল ঝুলছে। জালাল স্যারের পিছু পিছু আমরা ঘরের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালাম একটা বিছানায় কিংশুক শুয়ে আছে। এতক্ষণ মনের গহিনে একটা আশা ছিল যে গিয়ে দেখব কিংশুক বিছানায় বসে আছে, আমাদের দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, "চল যাই।" কিন্তু তাকে নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারলাম যে এটা কখনোই হবে না। কিংশুক নিস্তেজ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, তার চোখ আধখোলা, ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে বোঝা যায় না। তার মাথার কাছে যে ভদ্রমহিলাটি বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই কিংশুকের মা। আমাদের দেখে কিংশুকের মাথার কাছে মুখ নিয়ে বললেন "বাবা কিংশুক দেখ তোর বন্ধুরা এসেছে।"

মনে হল কিংশুকের চোখটা একটু খুলে গেল, আমাদের দেখেও সেখানে খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখা গেলে না। তার ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠল, মনে হল কিছু একটা বলছে।

কিংশুকের মা মাথাটা একটু কাছে নিলেন শোনার জন্যে, তার কথাটা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলছে সে খুব সরি!"

জালাল স্যার বললেন, "সরি হওয়ার কী আছে! তোর হাতে তো ছিল না। বেঁচে গেছিস সেটাই বেশি।"

কিংশুক আবার কিছু একটা বলল, এবারে আগের থেকে জোরে, আমরা সবাই শুনতে পেলাম, "কাজল।"

তৃণা বলল, "কাজল, তোকে ডাকছে।"

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কিংশুক মাথা নেড়ে বলল, "না, ডাকছি না।"

"তাহলে?" তৃণা জিজ্ঞেস করল, "কাজল কী?"

কিংশুক দুর্বল গলায় বলল, "কাজলকে করতে বল।"

"কাজলকে কী করতে বলব?"

"একটিং। আমার পার্টটা।"

সবাই এবার কিংশুকের দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকাল, হঠাৎ করে মনে হল ঘরের মাঝে যেন একটা বিদ্যুৎ চমক ঘটে গেল। এই ঘরে কথা বলা নিষেধ জেনেও ইফতি চিৎকার করে বলল, "ঠিকই বলেছে কিংশুক। কাজল তো করতে পারে।"

কিংশুক প্রথমবার একটু হাসল, বলল, "কাজলের পুরো নাটকটা মুখস্থ! কাজল পারবে।"

সবাই এক সাথে বলা বলতে শুরু করতেই জালাল স্যার ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ! কেউ কথা বলবি না।"

সবাই থেমে গেল। জালাল স্যার বললেন, "রোগী দেখা হয়েছে। এবারে বাইরে চল।"

কিংশুক আবার বলল, "স্যার, কাজলকে দিয়ে করাবেন কিন্তু।"

সে আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই স্যার ঠেলে আমাদের বাইরে নিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে এসেই সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করে, ইফতি উত্তেজিত গলায় বলল, "কিংশুক ঠিকই বলেছে। কাজল করবে রাশেদের পার্ট।"

তৃণা বলল, "হ্যাঁ, ওর পুরো স্ক্রিপ্ট মুখস্থ।"

শারমিন বলল, "কী আশ্চর্য! আমাদের একবারও মনে হয় নাই ব্যাপারটা!"

সুমি বলল, "একেবারে মানিয়ে যাবে।"

ইফতি বলল, "কোন রিহার্সেল পর্যন্ত করতে হবে না, কাজল নাটকের সব কিছু জানে!"

আমি এক ধরনের আতংক নিয়ে জালাল স্যারের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম হঠাৎ করে স্যারের চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করতে শুরু করেছে। স্যার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ! কাজল রাশেদের পার্টটা করলেই আমাদের ক্রাইসিস কেটে যায়। কী বল কাজল?"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "না স্যার, অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব?"

"স্যার, আমি জীবনে একটিং করি নাই। আমি জীবনে স্টেজে উঠি নাই। স্টেজে উঠার কথা চিন্তা করলে আমার হাঁটু কাপতে থাকে। আমি পারব না স্যার।"

"তোকে পারতে হবে। শুধু তুই আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবি।"

আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, "না, স্যার প্লিজ! আমাকে আর যা করতে বলবেন আমি করব স্যার, স্টেজে ওঠে একটিং করতে বলবেন না। প্লিজ স্যার। প্লিজ!"

"কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই। তুই একমাত্র ভরসা।"

"না স্যার" আমার গলা কেঁপে গেল, "আমি পারব না।"

ইফতি বলল, "তোকে কিছু করতে হবে না। শুধু স্টেজে দাঁড়িয়ে ডায়ালগগুলো বলবি, আর যা করার আমরা করব।"

অন্য সবাই মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, আমরা করব।"

সুমি বলল, "রাজি হয়ে যা কাজল।"

শারমিন বলল, "প্লিজ, কাজল প্লিজ।"

আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম, বললাম, "দেখ, তোরা বুঝতে পারছিস না। আমি রাজি হলে কী লাভ? স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি একটা কথাও বলতে পারব না। এতো সুন্দর নাটকটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। পুরোপুরি ডুবে যাবে। তোরা বুঝতে পারছিস না?"

তৃণা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, "দেখ কাজল, তোকে আমরা সবাই মিলে অনুরোধ করছি। নাটকটা নষ্ট হলে হোক—অন্তত বলতে পারব আমরা চেষ্টা করেছি! তুই যদি না করিস তাহলে তো চেষ্টাও করতেও পারব না। তুই না করিস না। প্লিজ। আমাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তুই রাজি হয়ে যা। একটা স্যাক্রিফাইস কর—প্লিজ।"

তৃণা এমনভাবে আমার চোখের দিকে তাকালো যে আমি আর না করতে পারলাম না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "ঠিক আছে। কিন্তু তোরা সবাই দায়ী থাকবি। এই নাটকটা দিয়ে যখন সারা স্কুলের সবার সামনে আমরা লজ্জা পাব তখন আমাকে তোরা দোষ দিতে পারবি না—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, নেহায়েৎ হাসপাতালের ভেতর দাঁড়িয়ে আছি তা না হলে সবাই নিশ্চয়ই আমাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিতো। জালাল স্যার বললেন, "আর দেরি করে কাজ নেই তাহলে, চল সবাই। অনেক কাজ বাকি।"

মাইক্রোবাসে যখন ফিরে আসছি সবাই তখন উত্তেজনায় টগবগ করছে, কথা বলছে, শুধু আমি চুপ করে বসে আছি। চাপা একটা ভয়ে আমার ভেতরটা থম থম করছে। আমি কেমন করে অভিনয় করবো? ছোট খাটো অভিনয় নয়, সবচেয়ে বড় অভিনয়। কেমন করে করবো?

সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে। স্টেজের মাঝখানে শারমিন গ্রামের মেয়ের মতো একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। পর্দা উঠতেই দেখা যাবে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে হাঁটছে, তখন আমি ভেতরে যাব। গ্রামের মেয়ে কুসুমকে দেখে বলব, "কী গো মেয়ে তোমার মনে

আজ এতো আনন্দ কিসের?" আমি মনে মনে একশবার প্র্যাকটিস করেছি—তবু মনে হচ্ছে মুখ ফুটে বলতে পারব না।

আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, জালাল স্যার আমার পেছনে। অন্য যারা অভিনয় করবে সবাই মেক আপ করে রেডি। লাইট ম্যান লাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মিউজিক ম্যান তার প্লেয়ার নিয়ে বসে আছে। পর্দা এখনো টানা আছে, শুনতে পেলাম কেউ একজন নাটকের নামটা ঘোষণা করলো এবং সাথে সাথে পর্দা টানতে শুরু করল। এতক্ষণ দর্শকরা কিচিরমিচির করে কথা বলছিল পর্দা সরে যেতেই সবাই নীরব হয়ে গেল, কোথাও এতোটুকু শব্দ নেই। শারমিন স্টেজের ভেতর নড়তে শুরু করেছে টুকটুক করে গ্রামের মেয়ের মতো হাঁটছে, গুন গুন করে গান গাইছে। স্টেজের অন্য মাথায় যাওয়ার সাথে সাথে আমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক ধক করে ঢাকের মতো শব্দ করছে। মনে হচ্ছে বুঝি ফেটে বের হয়ে আসবে। কানের মাঝে ঝাঁ ঝাঁ করছে কিছু শুনতে পাচ্ছি না মনে হচ্ছে পা দুটো বুঝি গেঁথে গেছে নড়তে পারব না। শারমিন স্টেজের অন্যপাশে চলে গেছে এখন আমার স্টেজে ঢুকতে হবে কিন্তু আমি নড়তে পারছি না। জালাল স্যার আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "যা, ঢোক।"

আমি জবুথবু হয়ে স্টেজে ঢুকলাম, মনে হল আমাকে দেখে সব দর্শক বুঝি হো হো করে হেসে উঠবে, কিন্তু কেউ হাসল না। ভয়ে ভয়ে দর্শকদের দিকে তাকালাম, স্টেজের ওপর থেকে আলো এসে চোখে পড়ছে ভালো করে দেখতে পারছি না। আবার শারমিনের দিকে তাকালাম সে চোখের কোনা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হঠাৎ মনে হল দৌড় দিয়ে চলে যাই, কিন্তু দৌড়াতেও পারলাম না, মনে হচ্ছে পা স্টেজের মাঝে গেঁথে গেছে। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি শুনতে পেলাম জালাল স্যার বলছেন, "কাজল, ডায়লগ।"

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম কী বলতে হবে। প্রথম কথাটি হচ্ছে, "কী গো মেয়ে তোমার মনে আজ এতো আনন্দ কিসের?" আমি বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না, এখন কী হবে?

উইংসের পেছন থেকে আরো অনেকে বলছে," কাজল, ডায়লগ! ডায়লগ!"

আমি ভয়ে ভয়ে উইংসের দিকে তাকালাম, সবাই ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তৃণাও দাঁড়িয়ে আছে—সে বয়স্কা একজন মহিলার মেকআপ নিয়ে সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে হাসার চেষ্টা করে বলল, "কাজল! তুই পারবি! কথা বল। প্লিজ।"

আমি আবার শারমিনের দিকে তাকালাম, হঠাৎ করে আমার মনে হল এই মেয়েটা শারমীন না, মেয়েটা গ্রামের একটা মেয়ে নাম কুসুম। আমি কাজল না, আমি গ্রামের চালচুলোহীন আধপাগল রাশেদ, ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াই। আমার মনে হলো স্টেজে নয়, আদিগন্ত বিস্তৃত একটা মাঠে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার আশপাশে আর কেউ নেই। হঠাৎ করে আমার বুক থেকে ভয়টা চলে গেল। আমি হাসি মুখে হেলতে দুলতে কুসুমের দিকে এগিয়ে গেলাম, বললাম, "কি গো মেয়ে! তোমার মনে আজ এতো আনন্দ কিসের?"

কুসুম আমার দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল, "অচেনা মেয়ের সাথে কথা বলছ তোমার লজ্জা করে না!"

"লজ্জা?" আমার হঠাৎ করে মনে হল আমি আসলে অভিনয় করছি না, আমি সত্যি সত্যি কথা বলছি! হাসি হাসি মুখে বললাম, "লজ্জা করে কথা না বললে তুমি তো অচেনাই থাকবে!"

আমি এতো সহজভাবে সুন্দর করে বললাম যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এক মুহূর্তে শারমিনও সহজ হয়ে গেল, সে চোখে খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি খানিকটা প্রশ্রয় নিয়ে বলল, "ভারি মুস্কিল তো! তুমি কোত্থেকে এসেছো এই গ্রামে?"

আমার তখন দুই হাত তুলে গানের সুরে একটা ডায়লগ বলার কথা প্রায় নিজের অজান্তেই সেটা বলেছি এবং সাথে সাথে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দের হাসি শুনতে পেলাম এবং আমি বুঝে গেলাম যে আসলে আমি পারব। শুধু যে পারব তাই না, কিংশুক থেকে ভালো পারব। শুধু যে কিংশুক থেকে ভালো পারব তাই না—অন্য যে কোন মানুষ থেকে আমি ভালো পারব।

এর পরে একটি ঘণ্টা কীভাবে কেটেছে আমি জানি না—আমি ভুলেই গিয়েছি আমি কাজল। স্কুলে পড়ি এখন একটা নাটক করছি। মনে হতে লাগল আমি সত্যিই গ্রামের ছন্নছাড়া ছেলে, অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। আঘাতে আঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তবু আমি মাথা নোয়াই না। কখনো কষ্ট, কখনো আনন্দ, কখনো ঘৃণা কখনো ভালোবাসা কখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইল—নাটকটি যখন শেষ হল কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ নেই, মনে হলো সবাই বুঝি নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে। তারপর প্রথমে একজন হাততালি দিতে শুরু করলো তার দেখাদেখি আরেকজন, তারপর আরেকজন। কিছুক্ষণের মাঝে হাত তালির শব্দে কান ফেটে যাবার অবস্থা। আমরা সব অভিনেতারা মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আর দর্শকরা দাঁড়িয়ে হাত তালি দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, কেউ আর থামছে না।

পুরস্কার বিতরণীতে আমাকে অভিনয়ের জন্যে আমাকে একটা বিশেষ গোল্ড মেডেল দেয়া হল। এর আগে আমি জীবনে কোন পুরস্কার পাই নি, পুরস্কার পেতে কেমন লাগে জানতামই না। প্রধান অতিথি গলায় মেডেলটি পরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "তোমার অভিনয় দেখে আমি কেঁদে ফেলেছি ছেলে।"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম।"

সত্যিই তাই—আমি আসলে অভিনয় করি নি আমি আসলেই কিছুক্ষণের জন্যে রাশেদ হয়ে গিয়েছিলাম। রাশেদ যখন হেসেছে আমি হেসেছি, যখন কেঁদেছে আমি কেঁদেছি। অভিনয় করা কঠিন কিন্তু সত্যি সত্যি অন্য একজন মানুষ হয়ে যাওয়া তো কঠিন নয়।

ব্যাপারটা টের পেলাম আমি আস্তে আস্তে। আমি হাবাগোবা কাজল স্টেজে এক ঘণ্টার জন্যে রাশেদ হয়ে অভিনয় করেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি কিন্তু স্কুলের বাচ্চাকাচ্চারা সেটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছে! নাটকের পরের দিন থেকে আমি সবার হিরো। বলতে গেলে সবাই বাসা থেকে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসেছে, বিখ্যাত খেলোয়াড়, গায়ক, শিল্পী আর সাহিত্যিকের পাশে আমাকে অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। ক্লাস সেভেনের একটা মেয়ে একদিন ক্যামেরা নিয়ে এসে আমার সাথে তার ছবি তুলে নিয়ে গেল। একেবারে যারা ছোট

হাসে পড়ে তারা প্রত্যেক দিন বাসা থেকে আমার জন্যে উপহার নিয়ে আসছে। প্রত্যেক দিনই আমি চিউয়িংগাম, লজেন্স, চকলেট আর বল পয়েন্ট কলম উপহার পাচ্ছি। আমাকে দেখলেই তারা খেলা ছেড়ে আমার কাছে ছুটে এসে আমাকে ঘিরে হৈচৈ করে এবং আমাকে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করতে হয়।

ব্যাপারটা যে শুধু মজা করার জন্যে তা না সেটা টের পেলাম কয়েক দিন পর। টিফিন ছুটির সময় আমরা কয়েক জন বসে গল্প করছি তখন হঠাৎ করে একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে হাজির হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কাজল ভাইয়া, তাড়াতাড়ি আসেন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

"মারামারি করছে।"

"কে মারামারি করছে?"

"সুমন আর মিঠু। তাড়াতাড়ি কাজল ভাইয়া।"

সুমন আর মিঠু কে আমি চিনি না কিন্তু ছেলেটার সাথে আমি এবং আমার সাথে অন্যেরা ছুটে গেল। গিয়ে দেখি সত্যিই প্রায় খুনোখুনি অবস্থা। দুইজন প্রচণ্ডভাবে মারপিট করছে, কিল-ঘুষি-লাথি কিছু বাকি নেই। জড়াজড়ি করে নিচে পড়ে গিয়ে একজন আরেকজনকে প্রায় খুন করে ফেলছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূর থেকে দেখছে, বড় কয়েকজন তাদের টেনে আলাদা করার চেষ্টা করছে কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। আমাকে আসতে দেখেই সবাই ফিসফিস করে বলতে শুরু করল, "কাজল ভাইয়া এসে গেছে। কাজল ভাইয়া এসে গেছে।"

আমি এসে কী করব জানি না, কিছু একটা করতে হয় তাই ছুটে গিয়ে দুজনকে টেনে সরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হল না। ধমক দিয়ে বললাম, "কী করছ এসব? বন্ধ করো।"

আমার গলা শুনে দুজনে আমার দিকে তাকালো এবং হঠাৎ ম্যাজিকের মতো কাজ হল একজন আরেকজনকে ছেড়ে দিয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। শরীরে ধুলোবালি লেগে আছে, শার্টের পকেট ছিঁড়ে ঝুলছে, ঠোঁটের নিচে দুই ফোটা রক্ত। আমি দুজনকে দুই হাতে ধরে আলাদা করে রেখে বললাম, "কী হয়েছে তোমাদের? কেন মারামারি করছ?"

দুইজন তখন একসাথে নালিশ করতে শুরু করল এবং মনে হল আবার বুঝি মারামারি লেগে যায়, আমি আবার ধমক দিয়ে তাদের থামালাম। মারামারি থেমেছে বলে সবাই তখন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল, কী হয়েছে সেটা ঠিক পরিষ্কার করে বুঝতে পারলাম না। মনে হল টেনিস বল দিয়ে কী একটা খেলা থেকে গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে— সবাইকে থামিয়ে আমি ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম তখন দেখতে পেলাম স্কুলের প্রিন্সিপাল, সুলতানা ম্যাডাম আর আমাদের ড্রিল স্যার এদিকে আসছেন, এই তিনজন হচ্ছে এই স্কুলের বাঘ ভালুক আর সিংহ। এক সাথে যদি তিনজন আসেন তাহলে অবস্থা খুব খারাপ, সাধারণত মারামারির খবর স্যার-ম্যাডাম পর্যন্ত যায় না, আজকে চলে গেছে। সুমন আর মিঠু নামে এই দুজন ছেলের কপাল খারাপ। খুবই খারাপ।

প্রিন্সিপাল স্যার, সুলতানা ম্যাডাম আর ড্রিল স্যারকে সবাই জায়গা করে দিল। প্রিন্সিপাল স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে? কে এখানে মারামারি করেছে?"

সুমন আর মিঠু মাথা নিচু করে দাঁড়াল, আমি দুজনের মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রিন্সিপাল স্যার আবার হুংকার দিলেন, "কে?"

সুমন আর মিঠু দুজনে তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমার মন হল একজন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করেছে। প্রিন্সিপাল স্যার আবার হুংকার দিলেন, "এটা কী স্কুল নাকি গুণ্ডা বদমাশ সন্ত্রাসীদের আখড়া? স্কুল কম্পাউন্ডের ভিতর মারামারি? পেয়েছোটা কী? এক ঘণ্টার ভিতর টি–সি দিয়ে বিদায় করে দেবো—"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "স্যার—"

প্রিন্সিপাল স্যার গলা নরম করে বললেন, "কী হয়েছে কাজল?" আগে আমাকে কেউ চিনতো না, নাটকের পর থেকে স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী স্যার ম্যাডামেরা আমাকে চিনেন।

"আসলে স্যার, এরা ঠিক মারামারি করে নাই। খেলতে খেলতে হঠাৎ করে একটু ইয়ে—"

"একটু কী?"

"এই ধাক্কা–ধাক্কির মতো—"

"ধাক্কা–ধাক্কি করলে ঠোঁট কেটে রক্ত বের হয়? শার্ট ছিঁড়ে—"

"একটু বেশি ধাক্কা–ধাক্কি হয়েছে সেজন্যে।" আমি কাচুমাচু মুখে বললাম, "এবারকার মতো মাপ করে দেন স্যার।"

"জংলী ভূতকে মাপ করে দিলে কী হয় জান? এরা মাথায় উঠে।"

"উঠবে না স্যার।" আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, "আমি কথা দিচ্ছি স্যার ওদেরকে আমি দেখে রাখব।"

প্রিন্সিপাল স্যার কড়া চোখে সুমন মিঠুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিন্তু এই দুজনের চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই। আমি বললাম, "প্লিজ স্যার।"

"ঠিক আছে।" প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, "এবারকার মতো মাফ করে দিলাম। কিন্তু আর কখনো যদি হয় একেবারে সরাসরি টিসি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

প্রিন্সিপাল স্যার অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "এদের হয়েছেটা কী? এই বয়সে মারামারি করছে, বড় হলে কী করবে?"

আমি এবারে একটু সাহস পেয়ে বললাম, "স্যার—"

প্রিন্সিপাল স্যার নরম গলায় বললেন, "কী হয়েছে কাজল?"

"আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম—"

"কী পড়েছিলে?"

"ছোট বাচ্চাদের নাকি খুব বেশি এনার্জি থাকে। তাদের দৌড়াদৌড়ি করে খেলাধুলা করে সেই এনার্জিটা বের করতে দিতে হয়, সেটা বের করতে না পারলে নাকি মারামারি করে ঝগড়াঝাঁটি করে।"

আমার মনে হল প্রিন্সিপাল স্যার একটু কষ্ট করে তার হাসি গোপন করলেন, বললেন, "এ ব্যাপারে তাহলে তোমার মতামতটা কী?"

"খেলাধুলার আরো বেশি ব্যবস্থা করে দেওয়া।"

"কীভাবে?"

"স্যার যদি ঐ দেয়ালে কয়েকটা বাস্কেটবলের হুপ লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবাই খেলতে পারবে। আর ঐ গাছটা থেকে কয়েকটা টায়ার যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে সবাই ঝুলতে পারবে।"

প্রিন্সিপাল স্যার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ড্রিল স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ফান্ডে কোন টাকা আছে?"

ড্রিল স্যার বললেন, "বেশি নাই স্যার।"

"আমাদের কন্টিজেন্সি ফান্ড থেকে কিছু লোন নিয়ে পশ্চিম দিকের দেয়ালে দুইটা বাস্কেটবল হুপ লাগিয়ে দেন।" প্রিন্সিপাল স্যার মাথা নেড়ে বললেন, "হি ইজ রাইট। স্কুলে ছোট বাচ্চাদের খেলার বেশি সুযোগ নেই। গাছগুলো থেকে কিছু টায়ার ঝুলিয়ে দেন। টায়ার বেশ সেফ।"

প্রিন্সিপাল স্যার অন্য দুজনকে নিয়ে চলে যাবার পর সবাই একটা আনন্দের শব্দ করল, আমি হাত তুলে বললাম, "এখন সুমন আর মিঠুর বিচার হবে।"

সবাই এবারে আগের থেকেও জোরে আনন্দের শব্দ করল।

আমি বললাম, "তোমরা বল, কে মারামারি শুরু করেছে? সুমন নাকি মিঠু?"

উপস্থিত ছেলেমেয়েরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল সুমন অন্যেরা বলল মিঠু। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখা যাচ্ছে দুইজনই অপরাধী। কাজেই দুজনেরই কঠিন শাস্তি।"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে চিৎকার করে বলল, "কী শাস্তি কাজল ভাইয়া? কী শাস্তি?"

"দুইজন দশ পা দূরে দাঁড়াবে। আমরা ওয়ান টু করে গুনবো তখন তারা একজন আরেকজনের কাছে এসে প্রথমে হ্যান্ডশেক করবে। তারপর কোলাকুলি করবে।"

কোনজন সুমন কোনজন মিঠু আমি এখনো জানি না, যার পকেট ছিঁড়ে ঝুলছে সে বলল, "মরে গেলেও না। গোলাম আযমের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারি কিন্তু মিঠুর সাথে কখনো হ্যান্ডশেক করব না।"

মিঠু নামের ছেলেটি বলল, "সুমনের সাথে হ্যান্ডশেক করার থেকে আমার হাত আমি কেটে ফেলব।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "আইন হচ্ছে আইন। বিচার হচ্ছে বিচার। সবাইকে বিচার মানতে হবে।" তারপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বললাম, "সুমন আর মিঠুকে দশ পা দূরে দাঁড় করাও।"

সবাই মহা উৎসাহে দুজনকে ঠেলে ঠেলে দশ পা দূরে দাঁড় করালো। এবারে আমি গুনতে শুরু করলাম, "ওয়ান।"

সবাই চিৎকার করে বলল, "ওয়ান" এবং সাথে সাথে দুই পাশ থেকে দুজনকে ঠেলে একপা সামনে নিয়ে এলো। আমি বললাম, "টু" সাথে সাথে আরো এক পা। "থ্রি" বলার সাথে সাথেই প্রবল উৎসাহে ধাক্কা দিয়ে দুজনকে প্রায় একজনের ওপর আরেকজনকে ফেলে দিল! "হ্যান্ডশেক" "হ্যান্ডশেক" বলে সবাই চিৎকার করতে থাকলো এবং আমি গিয়ে

দুজনের হাতে হ্যান্ডশেক করিয়ে দিলাম। একবার হ্যান্ডশেকের পর কোলাকুলিটা আর খুব বেশি কঠিন হল না। যখন দেখলাম প্রথমে সুমন তারপর মিঠুর মুখে হাসি ফুটেছে তখন বুঝতে পারলাম বিপদ কেটে গেছে।

আমরা যখন আমাদের ক্লাসে ফিরে আসছি তখন তৃণা বলল, "কাজল তুই দেখি মিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে গেছিস?"

"বঙ্গবন্ধু?"

"হ্যাঁ! জনগণের নেতা!"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "এই নাটকটার জন্যে। কেউ বুঝতে পারছে না যে নাটকের আমি আসল আমি না!"

তৃণা বলল, "তুই তো ভালোই করছিস। যেভাবে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে বাস্কেট বল হুপ আদায় করে নিলি—"

ইফতি বলল, "হ্যাঁ। প্রিন্সিপাল স্যার এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য!"

শারমিন বলল, "কাজলের ভেতরে কিন্তু আসলেই একটা নেতা নেতা ভাব আছে। তাই না?"

সুমি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ! আসলেই আছে।"

সবাই কিছু না কিছু বলল শুধু খালেদ চুপ করে থাকল। শুধু যে চুপ করে থাকল তাই না, তার মুখটা আরো কালো হয়ে গেল।

স্কুলে বাস্কেটবল হুপ লাগানোর পর সব ছেলেমেয়ে বাস্কেটবল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল প্রথম বলটা আমাকে ছুড়তে হবে! আমি গিয়ে বাস্কেট বল ছুড়লাম, এমনিতে আমি বাস্কেটবল খেলায় যাচ্ছেতাই কিন্তু কপাল গুণে প্রথমবারই বাস্কেট হয়ে গেল সাথে সাথে সবার কী চিৎকার!

শুধু যে বাস্কেটবল হুপ তা নয়, ক্লাস ফোরের ছেলেমেয়েরা একটা ডিটেকটিভ ক্লাব খুলেছে আমাকে সেখানে যেতে হল। শুধু যে যেতে হল তা নয় ডিটেকটিভ ক্লাবের উপকারিতার ওপর আমাকে বক্তৃতাও দিতে হল। এই প্রথম আমি একটা বক্তৃতা দিলাম—খুব যে খারাপ দিলাম তাও নয়। ক্লাস ফাইভ মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি আঁকার একটা প্রতিযোগিতা করল—আমি ছবি আঁকার কিছু বুঝি না তবুও আমাকে জোর করে একজন বিচারক তৈরি করে ফেলল! শুধু যে ছোট ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তা না, ক্লাস টেনের পিকনিকেও আমাকে যেতে হল, বড় বড় মেয়েরা আমাকে নিয়ে ছবি তুললো।

আমাদের যারা নাটকে অভিনয় করেছে তারাও দেখি একদিন দল বেঁধে আমার কাছে হাজির। ইফতি দলের নেতা, সে বলল, "কাজল, আমরা ঠিক করেছি তোকে নিয়ে কাল আমরা ফাস্টফুড খেতে যাব।"

"আমাকে নিয়ে কেন?"

"তুই একটিং করতে রাজি হয়ে আমাদের নাটকটি রক্ষা করেছিস সেই জন্যে।"

কিংশুক মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমার এই স্কুলে হিরো হওয়ার কথা ছিল। হয়ে গেলি তুই। খোদার কোন বিচার নাই।"

ইফতি বলল, "খোদার বিচার ঠিকই আছে। ঠিক সময়ে এপেন্ডিসাইটিস বাধিয়ে আমাদের নাটকটা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছিলি বলে খোদা তোকে শাস্তি দিয়েছে।"

কিংশুক গম্ভীর হয়ে বলল, "এপেন্ডিসাইটিসটা তাহলে কে দিয়েছিল? ঠিক সময়ে না দিলে পারতো না?"

"যাই হোক—" তৃণা বলল, "সেটা নিয়ে পরে অনেক ঝগড়া করা যাবে। তাহলে ঠিক থাকল আগামীকাল স্কুল ছুটির পর। বনানীর ম্যাড হাউজে।"

আমি জানতে চাইলাম, "কে কে যাবে?"

"আমরা যারা যারা নাটকে ছিলাম। আর কিংশুক। ওকে না নেয়াই উচিত ছিল কিন্তু মায়া করে নিচ্ছি।"

কিংশুক গরম হয়ে বলল, "দেখ বেশি কথা বলবি না। আমি যদি সেদিন কাজলকে নেয়ার আইডিয়াটা না দিতাম তাহলে এখনো তোমরা সবাই বসে আঙুল চুষতে! বুঝেছ?"

শারমীন আর সুমি মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।"

বনানীর ম্যাড হাউজ একটা হাইফাই ফাস্ট ফুডের দোকান। আমি যখন আগের স্কুলে পড়তাম তখন অনেকবার বন্ধু বান্ধব নিয়ে এখানে খেতে এসেছি। নতুন স্কুলে যাবার পর থেকে একবারও আসি নি, প্রথমবার নতুন বন্ধুদের নিয়ে যাব চিন্তা করে আমার বেশ ভালোই লাগলো। স্কুল ছুটির পর আমরা টেম্পো আর রিকশা করে চলে এসেছি। কোণার দিকে একটা টেবিলে সবাই গোল হয়ে বসে হ্যামবার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস আর পেপসি অর্ডার দিয়েছি। ইফতি বলল, "খাবারের কতো দাম দেখেছিস?"

কিংশুক বলল, "এটা কী তোর আর আমার খাবার জায়গা? এটা বড়লোকদের জায়গা।"

ইফতি বলল, "বড়লোকদের জায়গায় তুই যে চলে এলি?"

তৃণা বিরক্ত হয়ে বলল, "ধুত্তরি ছাই, বড়লোক–ছোটলোকের গল্পটা বন্ধ কর দেখি।"

শারমীন বলল, "হ্যাঁ, ভালো লাগে না। একদিন খেতে এসেছি আর কী বাজে আলাপ।"

খালেদ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলল, "আমাদের যতো বিল আসবে সেটা দিয়ে একটা কাজের বুয়ার দুই মাসের বেতন হয়ে যাবে।"

সবাই মিলে আনন্দ করতে এসেছি, সেটাকে এভাবে চুপসে দেয়ার মতো কাজে খালেদের কোন তুলনা নেই।

ঠিক এরকম সময়ে আমাদের বয়সী আরো কয়জন ছেলেমেয়ে হৈচৈ করে ভেতরে ঢুকলো। আমি চমকে উঠে দেখলাম এরা আমার আগের স্কুলের ছেলে–মেয়ে। সাদিব, শাফফাত, নাসিয়া আর আরো দু'জন মেয়ে যাদেরকে আমি আগে দেখি নি। তারা ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে তর্ক করতে করতে হঠাৎ ঘুরে আমাদের দিকে তাকালো এবং আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। সাদিবের মুখ হা হয়ে যায় এবং কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "ও মাই গড!"

তার সাথে যারা ছিল তারা অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

সাদিব আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, "কাজল!"

শাফফাত আর নাসিয়া অবাক হবার মতো একটা শব্দ করলো। অচেনা দুজন মেয়ের একজন বলল, "কোন কাজল?"

সাদিব চাপা স্বরে বলল, "মনে নাই? আলতাফ নবীর ছেলে।"

আমি বুঝতে পারলাম আমার চারপাশে যারা বসে আছে, তৃণা, কিংশুক ইফতি এবং অন্যেরা একেবারে ইলেকট্রিক শট খাওয়ার মতো চমকে উঠেছে। সাদিব কিছু লক্ষ্য করে নি, সে প্রায় ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলর, "কাজল তুই? আমি শুনেছিলাম তুই আমেরিকা চলে গেছিস!"

"না, যাই নাই।"

"এটা কী সত্যি তোর বাবা নাকি তোদের বের করে দিয়েছে?"

"না সত্যি না।"

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

সাদিব অধৈর্য হয়ে বলল, "তুই কোথায় আছিস?"

আমি বললাম, "সেটা অনেক বড় স্টোরি।"

"তোর টেলিফোন নাম্বার দে।"

"আমার টেলিফোন নাম্বার নাই।"

সাদিব অবাক হয়ে একবার আমার দিকে তারপর আমার চারপাশে বসে থাকা ইফতি, কিংশুক, তৃণা, শারমীন, সুমি, খালেদ, নজরুল আর নন্দিতার দিকে তাকালো। তারপর প্রায় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, "টেলিফোন নাই মানে?"

"মানে টেলিফোন নাই।" আমি সাদিবের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন লাভ হল না।

সাদিবের কাছে নাসিয়াও চলে এসেছে, সে চোখ বড় বড় করে ইংরেজিতে বলল, "এটা কী সত্যি যে তোমরা খুব টাকা-পয়সার কষ্টে আছ?"

নাসিয়া মেয়েটার বুদ্ধি খুব বেশি নয়, এ ধরনের প্রশ্ন যে করা ঠিক না সেটা জানে না। আমি হেসে বললাম, "না এটা সত্যি না।"

"তুমি নাকি হেঁটে স্কুলে যাও—তোমার গাড়ি নেই। টেলিফোন নেই—"

"সেটা ঠিক।"

"স্কুলের খরচ বেশি বলে একটা সস্তা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে গেছ?"

মেয়েটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, আমি তাই চারপাশের সবাইকে দেখিয়ে বললাম, "এই যে এরা সবাই আমার সস্তা বাংলা মিডিয়াম স্কুলের বন্ধু।"

"ও!" নাসিয়া হঠাৎ করে নিজেকে সামলে নিয়ে পেছনে সরে গেল। আমি বললাম, "তোমরা বসো, আমি যাবার আগে তোমাদের সাথে কথা বলব।" সোজা বাংলায় যার অর্থ তোমরা এখন এখান থেকে যাও। সাদিব আর নাসিয়া আমার ইঙ্গিতটা বুঝে গিয়ে পেছনে একদিকে বসে একটু পরে পরে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

আমি এবার আমার চারপাশে তাকালাম, সবাই একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "কী হল তোরা এভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন?"

শারমীন বলল, "কী আশ্চর্য! তুই আলতাফ নবীর ছেলে!"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "হ্যাঁ।"

"আগে বলিস নি কেন?"

"সমস্যা আছে—তোরা তো টের পাচ্ছিস।"

"তা ঠিক!"

তৃণা বলল, "তাই তো সেদিন খবরের কাগজের ছবিটা এতো চেনা চেনা লাগছিল!"

কিংশুক ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই আসলেই আলতাফ নবীর ছেলে? আসলেই তুই এতো বড়লোক?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ আমি আলতাফ নবীর ছেলে, কিন্তু আমি বড়লোক না। আমি আর আম্মু সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি।"

খালেদ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

তৃণা আমাকে উদ্ধার করল, বলল, "বাংলাদেশের সবাই জানে কেন। তুই খবরের কাগজ পড়িস না?"

খালেদ বলল, "আমি ওর মুখে শুনতে চাইছিলাম।"

শারমীন বলল, "এটা কী শোনার মতো জিনিস?"

আমি বললাম, "তোরা শুনতে চাইলে বলতে পারি, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তোরা আমার একটা উপকার করবি?"

সবাই একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। ইফতি জিজ্ঞেস করল, "কী উপকার?"

"প্লিজ কাউকে এটা বলিস না। প্লিজ!"

তৃণা বলল, "ঠিক আছে বলব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"কথা দিচ্ছিস সবাই?"

"কথা দিচ্ছি।"

কিংশুক এগিয়ে এসে বলল, "কী সাংঘাতিক ব্যাপার! আমার সব-সময়ে জানার ইচ্ছে ছিল বড়লোকেরা কিভাবে থাকে! তুই বলবি?"

"আমি এখন আর বড়লোক না।"

"যখন ছিলি তখন কী করতি? বলবি?"

আমি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলাম, "বলব। কী জানতে চাস?"

"গাড়ি দিয়ে শুরু করি। তোদের কী গাড়ি ছিল?"

তৃণা বলল, "গাধা কোথাকার। আগে জিজ্ঞেস কর কয়টা গাড়ি ছিল!"

ইফতি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ! কয়টা গাড়ি ছিল?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে ছিল চারটা। অফিসেরগুলো ধরলে হয় ছয়টা। দুইটা পাজেরো, একটা টয়োটা ক্রাসিডা, একটা হোন্ডা, আব্বুরটা ছিল মার্সিডিস, আম্মুরটা ভলবো।"

সবাই একটা বিস্ময়ের শব্দ করে চোখ বড় বড় করে আমার আরো কাছে এগিয়ে এলো।

আব্বু বলেছিলেন তিন মাস পর আমি আর আম্মু ফিরে গিয়ে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো। তিন মাস অনেক দিন আগে পার হয়ে গেছে, এখন আমরা ছয় মাসে পা দিয়েছি কিন্তু এখনো আব্বুর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হয়নি। আমাদের ঘরে এখনো কোন ফার্নিচার নেই, আম্মু বলেছেন ইচ্ছে করলেই নাকি কিছু ফার্নিচার কেনা যায়, কিন্তু আমরা তবু কিনছি না, ফার্নিচার ছাড়াই মনে হয় ভাল। বাইরের ঘরে বসার জন্যে শুধু সুন্দর একটা কার্পেট আর কয়েকটা কুশন কেনা হয়েছে। ঘরের দেয়ালগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে বলে সেখানে কয়েকটা জলরংয়ের ছবি ফ্রেম করে টানানো হয়েছে। এগুলো অবশ্যি কেনা হয়নি, আম্মুর শিল্পী বন্ধুরা উপহার দিয়েছেন তাঁকে। আমার ক্লাসের বন্ধুরা যখন জেনেছে আমি আসলে আলতাফ নবীর ছেলে তখন সবাই মিলে একদিন আমাদের বাসায় আসতে চেয়েছে আম্মুকে দেখার জন্যে—আম্মু তখন আরো কয়টা থালাবাসন কিনেছেন। সবাই মিলে একদিন এসেছিল। আমি আর আম্মু মিলে রান্না করে খাইয়েছি (ভাত, বেগুন ভাজা, মুরগির মাংস, ডাল এবং দই) খেয়ে সবাই খুব খুশি! আমাদের বাসায় এখনো কোন ফ্রিজ নেই—আম্মু বলেছেন ইচ্ছে করলে ছোট একটি ফ্রিজ কেনা যায় কিন্তু আম্মু কিনতে চাইছেন না। আগে আমাদের যা থাকা সম্ভব সবই ছিলো, কাজেই সবকিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে কেমন লাগে সেটা আমরা জানি। কোন কিছু ছাড়া বেঁচে থাকতে কেমন লাগে এখন সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। আম্মুর ধারণা আসলে বেঁচে থাকতে খুব বেশি জিনিস লাগে না।

একটা ক্যাসেট প্লেয়ার অবশ্যি কেনা হয়েছে, সেখানে বেশির ভাগ সময়েই আম্মুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজতে থাকে, আমার নিশ্চয়ই কোন একটা পরিবর্তন হয়েছে, কারণ আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে তত খারাপ লাগে না। আম্মুর অবশ্যি কোন পরিবর্তন হয়নি—আমার জন্য যে দুই একটা ইংরেজি গানের ক্যাসেট কিনেছি আম্মু এখনো সেগুলো কোনভাবেই শুনতে রাজি না—আম্মু যখন থাকেন না শুধুমাত্র তখনই আমি সেগুলো শুনতে পারি।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পর খালেদ একদিন চা বাগানে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব নিয়ে এলো। একটা চা বাগানের ম্যানেজারের সাথে তার আব্বার খুব বন্ধুত্ব, সেই চা বাগানে খুব সুন্দর একটা গেস্ট হাউজ আছে, আমরা সেখানে কয়েকদিন থাকতে পারি। শীতের দিন চা বাগান নাকি অপূর্ব একটি জায়গা। আমি যতদূর জানি আমার আব্বুর কয়েকটা চা বাগান আছে কিন্তু আমি কখনো চা বাগানে যাইনি। খালেদ বলল তার আম্মা আমাদের নিয়ে যাবেন কাজেই ইচ্ছে করলে মেয়েরাও যেতে পারে। শুনে তৃণা যাওয়ার জন্যে খুব আগ্রহ দেখালো। ক্লাসের আরো কয়েকজন ছেলেমেয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু শেষ

পর্যন্ত দেখা গেলো যাচ্ছে শুধু আমাদের নাটকের গ্রুপ। ছেলেদের ভেতর আমি, কিংশুক, ইফতি আর খালেদ। মেয়েদের ভিতরে তৃণা, শারমিন আর সুমি। খালেদের আম্মা সাথে থাকবেন, কাজেই আমাদের থাকা খাওয়া কিছু নিয়েই চিন্তা করতে হবে না। তৃণা আমাদের জানালো খালেদ মানুষটা একটু খসখসে ধরনের হলেও তার আম্মু নাকি খুব হাসি-খুশি ভাল মানুষ।

আগে আমি আব্বু আর আম্মুর সাথে অনেক জায়গায় গিয়েছি—আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক কিছু বাকি নেই, কিন্তু কেন জানি না সেই বেড়ানোগুলো সবই একরকম। প্লেনে করে যাওয়া, হোটেলে থাকা, তাড়াহুড়ো করে বড় বড় কয়েকটা জিনিস দেখে আবার তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসা। সেগুলোর তুলনায় এবারের চা বাগানে যাওয়া বরং আমার কাছে বেশি আনন্দের বলে মনে হতে লাগলো। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে চা বাগানে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আগে আমার সত্যিকারের কোন বন্ধু ছিল না এখন অনেক কয়জন খাঁটি বন্ধু হয়েছে, এই বন্ধুদের সাথে যেটাই করি সেটাই মজার মনে হয়।

যেদিন আমাদের যাবার কথা সেদিন ভোর বেলা আম্মু এসে আমাকে খালেদদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাদের বাসার সামনে নীল রংয়ের একটা বাহারি মাইক্রোবাস যার জানালায় পর্দা ঝুলছে, এর আগে আমি কোনদিন পর্দাওয়ালা মাইক্রোবাস দেখিনি, দেখেই হাসি পেয়ে যায়। কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য সবাই এসে গেল, প্রথমে যেরকম বড় পরিকল্পনা করা হয়েছিল এখন সেটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। আজ ভোরে রওনা দেবো, দুপুরে চা বাগান পৌঁছে যাব। চা বাগানে মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে পরদিন দুপুর বেলা রওনা দিয়ে রাতের মাঝে চলে আসব। একদিনের ব্যাপার বলে আমাদের সেরকম কোন জিনিসপত্রও নেই, সবার একটা করে ব্যাগ। সেই ব্যাগগুলো গাড়িতে তুলছে কাসেম নামের খুব চালবাজ ধরনের একজন মানুষ। মানুষটা লম্বা এবং শুকনো, নাকের নিচে নোংরা গোঁফ, চোখ দুটো কুতকুতে ভাঙ্গা গাল এবং উঁচু চোয়াল। চেহারায় কোন ছিরি-ছাদ নেই। একজন মানুষের চেহারা ভাল নয় বলে তাকে অপছন্দ করা ঠিক নয়, কিন্তু এই মানুষটি শুধু যে চেহারা ভাল নয় তা নয় কথাবার্তাও খুব চালবাজ ধরনের, মানুষটাকে আমার একটুও পছন্দ হলো না। কাসেম খালেদদের বাসায় ম্যানেজার টাইপের মানুষ, খালেদের আম্মাকে কাজ-কর্মে সাহায্য করার জন্যে সেও নাকি আমাদের সাথে চা বাগানে যাবে। শুনে আমার একটু মন খারাপ হলো, একজন চালবাজ ধরনের মানুষ সবসময় কাছাকাছি থাকলে কারো ভাল লাগার কথা নয়।

আমাদের শুরু করার কথা ছিল সকাল আটটার সময়। কিন্তু রওনা দিতে দিতে নয়টা বেজে গেল। খালেদের আম্মা বললেন চার ঘণ্টার মাঝে পৌঁছে যাব, কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আমি আগে আব্বু এবং আম্মুর সাথে অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি কিন্তু কখনো এভাবে বেড়াতে যাইনি, আমার কাছে এটা খুব মজার মনে হতে লাগল। যেমন মনে করা যাক বসার ব্যাপারটি—ড্রাইভারের পাশে বসেছে চালবাজ কাসেম, পেছনে ছয়জনের সিটে আমরা আটজন, একজন বড় আর সাতজন ছোট। বসতে বেশ চাপাচাপি হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে মজা। কে মোটা, কে বসতে বেশি জায়গা নিচ্ছে কে বেশি নড়ছে সেগুলো নিয়ে

ক্রমাগত একজন আরেকজনকে দোষ দিতে লাগল আর সবাই অকারণে হি হি করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। খালেদের আম্মা মানুষটা মোটেও খালেদের মতো না, খুব হাসি-খুশি মানুষ এবং খুব সহজেই আমাদের হাসা-হাসিতে যোগ দিয়ে ফেললেন।

সময় কাটানোর জন্যে আমরা নানারকম খেলা আবিষ্কার করলাম, বেশিরভাগ খেলাই হচ্ছে একেবারে হাস্যকর, অন্য কোন সময় কেউই এরকম হাস্যকর খেলায় যোগ দিতো না, কিন্তু আজকে আমাদের সবার মাঝে এমন একটা স্ফূর্তির ভাব যে আজ যেটাই করি সেটাই মনে হচ্ছে মজার। খালেদও মনে হলো আজ এই প্রথমবার আমার সাথে সহজ হয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলো।

খালেদের আম্মার হিসেব অনুযায়ী আমাদের বেলা একটার সময় পৌঁছানোর কথা কিন্তু ভৈরবে ফেরিতে দেরি হলো বলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের দুইটা বেজে গেলো। মাইক্রোবাসে সারাক্ষণই আমরা চিপস, কোল্ড ড্রিংকস, চানাচুর এইসব খেয়েছি কিন্তু তারপরও আমরা যখন পৌঁছেছি তখন একেকজনের পেটে এমন খিদে যে মনে হতে লাগলো যে সবাই একটা একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব।

চা বাগানটি ভারি সুন্দর কিন্তু ভেতরের রাস্তাটি কাঁচা, গেস্ট হাউজটা এক পাশে একটা টিলার উপর এবং ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে হলো। আমাদের মাইক্রোবাসটা দেখেই একজন ছোটখাটো মানুষ এসে গেট খুলে দিল, ভেতরে ঢুকে মাইক্রোবাসটা থামতেই আমরা হুটোপুটি করে নেমে পড়লাম এবং সবাই একসাথে বললাম, "ইস! কী সুন্দর!"

টিলার উপর থেকে নিচে চায়ের বাগানগুলো দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ বুঝি সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। বাগানের মাঝে মাঝে ছায়াবৃক্ষ, এই ছায়াবৃক্ষ গাছগুলো এতো সুন্দর যে দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। গেস্ট হাউজটা পুতুলের বাসার মতো, লাল টাইলসের ছাদ এবং সাদা দেয়াল। দরজা-জানালাগুলো উজ্জ্বল সবুজ, চারপাশে নানা ধরনের গাছ-গাছালির মাঝে মনে হচ্ছে বুঝি এটি যেন সত্যিকারের বাসা না, যেন কেউ এটি রংতুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এখানকার পরিবেশ, একেবারে সুনসান নীরব, শুধু বাতাসে গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আমার মনে হলো এরকম একটা জায়গা আমি বুঝি সারা জীবন থাকতে পারব।

গাড়ির শব্দ শুনে ভেতর থেকে আরো একজন বুড়ো পুরুষ মানুষ এবং একজন কালো রংয়ের খুব সুন্দর মেয়ে বের হয়ে এলো। খালেদের আম্মা নিশ্চয়ই এখানে প্রায়ই আসেন, কারণ দেখতে পেলাম সবাইকে ভাল করে চিনেন, সবার খোঁজখবর নিলেন, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী রে হেনা, তুই দেখি মুটিয়ে যাচ্ছিস!"

হেনা হি হি করে হেসে বলল, "আপুনি যে কী বোলেন খালাম্মা। আমি আবার মুটালাম কখুন?"

খালেদের আম্মা খুব সহজেই দেখি এদের সাথে তুই তুই করে কথা বলছেন, এরা নিশ্চয়ই অভ্যস্ত কিন্তু আমার শুনতে খুব খারাপ লাগল। আমি আগেও শুনেছি চা বাগানে যারা কাজ করে তাদেরকে নাকি মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না। এখানকার মানুষগুলোর উচ্চারণগুলো অন্যরকম, শুনতে খুব মজা লাগে। খালেদের আম্মা বললেন, "খাবারের কী ব্যবস্থা বাবুর্চি? খিদেয় যে জান যায়।"

বুড়ো মতোন মানুষটি বলল, "সব রেডি, বেগম সাহেব।"

হেনা তার মজার উচ্চারণে বলল, "আপনারা আসতে দেরি কোরলেন হামরা আরও ভাবলাম যুদি না আসেন!"

"না আসব কেন! দে খাবার দে টেবিলে।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা সবাই হাত পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও।"

আমরা হৈ হৈ করে গেস্ট হাউজের ভেতরে ঢুকে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর, প্রত্যেকটা ঘরে দুটি করে বিছানা পাতা, বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর। বড় বড় জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। জানালায় লোহার শিক দেয়া, নিশ্চয়ই অনেক আগে তৈরি হয়েছে তখনো গ্রিল ব্যবহার করা শুরু হয়নি। মশা বা পোকা-মাকড় যেন আসতে না পারে সেজন্যে সবগুলো জানালায় নেট দেওয়া আছে। গেস্ট হাউজে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে বাথরুমগুলো, সাদা টাইলস দেওয়া বড় বড় বাথরুম, বড় বড় বেসিন সবকিছু ঝকঝক করছে। বাথরুমেও যেন গরম না লাগে সে জন্যে ছোট ছোট ফ্যান, যে গেস্ট হাউজটা তৈরি করেছে সে নিশ্চয়ই খুব সৌখিন মানুষ ছিল।

আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের মতো "এটা আমার রুম" "এটা আমার রুম" বলে ছোটাছুটি করতে লাগলাম তাই দেখে হেনা নামের মহিলাটি হি হি করে হেসে তার সেই মজার ভাষায় বলল, "ছোট সাহেবরা আপুনেরা রুম দোখল করার অনেক সোময় পাবেন আগে কিছু খেয়ে নেন। গায়ে শোক্তি হোলে আরও ভালো দোখল করতে পারবেন! বাবুর্চি অনেক কোষ্ট করে আপুনাদের জন্যে ভাত-গুস পাকাইছে!"

আমরা 'ভাত-গুস' খাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি করে হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে চলে এলাম, সেখানে বড় টেবিলে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে খাবার দেওয়া হয়েছে। আমি আর আম্মু আলাদা হবার পর থেকে আমরা মেঝেতে খবরের কাগজ পেতে খাই অনেক দিন পর আজ টেবিলে খেতে বসে আমার অন্যরকম লাগতে থাকে। টেবিলে অনেক রকম খাবার, রান্নাও খুব ভাল খিদেও পেয়েছে সাংঘাতিক, সবাই একেবারে রাক্ষসের মতো খেলাম। খাওয়া শেষ করার পর খালেদের আম্মা বাবুর্চি রামলালকে ডেকে পাঠালেন। রামলাল এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল, খালেদের আম্মা বললেন, "খুব ভাল রান্না হয়েছে রামলাল।"

রামলাল তার পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

"রাত্রে আমাদের কী খাওয়াবি?"

"কী খাবেন বোলেন বেগম সাহেব।"

খালেদের আম্মা আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবে তোমরা? পরটা শিক কাবাব?"

ইফতি এবং কিংশুক হাতে নেড়ে বলল, "ইয়েস!"

খালেদের আম্মা বললেন, "রামলাল, তুই মাজহারকে একটু ডেকে পাঠা।"

"মাজহার স্যার আসতেছেন বেগম সাহেব।"

"ঠিক আছে। আমাদের চা দে। চা বাগানের স্পেশাল চা।"

চা বাগানের সবই খুব সুন্দর কিন্তু এই তুই তুই করে কথা বলাটা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। খুব বন্ধু হলে মানুষ তুই করে কথা বলে কিন্তু মানুষকে তাচ্ছিল্য করার জন্যে তুই করে বলে কেমন করে?

গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার মাজহার একটু পরেই খোঁজ নিতে এলো, খালেদের আম্মা সবাইকে খুব ভাল করে চেনেন, তাকে বলে দিলেন আমাদের নিয়ে চায়ের ফ্যাক্টরিটা দেখিয়ে দিতে। সেটা দেখে আমরা বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখব। মাজহার বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ এবং হাফ প্যান্ট পরে থাকে, হাতে-পায়ে শক্ত মাসল সাপের মতো কিলবিল করছে। চোখগুলো কেমন জানি পিঙ্গল রংয়ের, দেখে ভয় করে। মানুষটি অবশ্যি হাসিখুশি, আমাদেরকে তখন তখনই চা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাবার জন্যে রেডি হয়ে গেলো।

আমরা যখন বাইরে যাবার জন্যে জামা-কাপড় বদলে নিলাম তখন জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম মাজহার আর কাসেম বাইরে একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কথা বলার ভঙ্গিটা একটু অদ্ভুত। মনে হয় ফিরে দু'জনে খুব বন্ধু—খুব দরকারি কিছু নিয়ে পরামর্শ করছে। দু'জন থাকে দুই জায়গায় কেমন করে তারা একজন আরেকজনের এমন বন্ধু হলো কে জানে। আমি জানালা দিয়ে তাদের দেখছিলাম, কথা বলতে বলতে হঠাৎ কাসেম মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে কেমন জানি চমকে উঠে সরে গেলো, এর কারণটা আমি বুঝতে পারলাম না। দু'জন মানুষ বন্ধুর মতো কথা বলা কী অপরাধ?

গল্প-উপন্যাসে সব সময় বলা হয় মেয়েরা নাকি সাজতে বেশি সময় নেয়। আজকে হলো একেবারে উল্টো। তৃণা, শারমিন আর সুমি ঝটপট রেডি হয়ে গেলো কিন্তু ইফতি আর খালেদের সাজগোছ আর কিছুতেই শেষ হয় না! আমরা ধাক্কাধাক্কি করে তাদের বের করলাম, খালেদের আম্মা বললেন তিনি আর যাবেন না, শুয়ে বিশ্রাম নেবেন।

চায়ের ফ্যাক্টরি যাবার জন্যে আমাদের টিলা থেকে নিচে নেমে যেতে হলো, কি সুন্দর একটা রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ, একেবারে ছবির মতো দেখাচ্ছে। হেঁটে হেঁটে আমরা ফ্যাক্টরিতে এলাম। মাজহার আমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলো। ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের সবাইকে একটা করে চায়ের প্যাকেট উপহার দিলো—কী চমৎকার ঘ্রাণ সেই চায়ের।

আমরা আবার হেঁটে হেঁটে গেস্ট হাউজে ফিরে এলাম আমাদের জন্যে নাস্তা তৈরি করে রাখা আছে, আলু ভাজা, চপ আর কেক। সাথে চা বাগানের সেই স্পেশাল চা। আমি এমনিতে বেশি চা খাই না কিন্তু এখানে এসে ঘনঘন চা খাচ্ছি, চা বাগানের চায়ের এতো সুন্দর ঘ্রাণ যে শুধু খেতেই ইচ্ছে করে!

নাস্তা করে আমরা আবার হাঁটতে বের হলাম, এবার আমাদের গাইড হেনা। তার মতো হাসি-খুশি মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না সারাক্ষণ সে তার অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলে গেলো—দেখে বোঝাই যায় না তার বিয়ে হয়েছে, তার নাকী দুইজন ছেলেমেয়ে আছে। আমাদেরকে সাথে নিয়ে সে চা-বাগান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো—কোন চা গাছে কী রকম, কেমন করে চা-পাতা তুলতে হয়, চায়ের ফুল দেখতে কেমন এরকম হাজারটা বিষয় নিয়ে কথা বলল। শারমিন আর ইফতি ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, একটু পরে পরে নানারকম ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হলো।

চায়ের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে একসময় সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠে গেল। চারদিক তখন একটা আলো-আঁধারি ভাব, আমার মনে হতে লাগলো এরকম একটা জায়গায় সারা জীবন থাকতে পারলে বুঝি জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই। হেনা বলল, "চোলেন যাই, ওন্ধোকার হোয়ে যাচ্ছে।"

কিংশুক বলল, "অন্ধকার হলে কী হয়? ভূত আছে নাকী?"

হেনা মাথা নেড়ে বলল, "ভূত আছে, পোরী আছে সোব কিছু আছে বাগানে।"

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা হেনাকে চেপে ধরলাম, তখন সে ভূতের গল্প শুরু করে দিল। বাগানে একজন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবার পর কীভাবে প্রতিরাতে তার ভূত এসে নাকি গলায় ডাকাডাকি করতো তার রোমহর্ষক গল্প। আবছা অন্ধকারে চা বাগানের মাঝে সেই গল্প এতো মানিয়ে গেলো যে আমরা কেউ সেটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম না!

গেস্ট হাউজে ফিরে এসে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাইরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি। বাগানের নিজস্ব জেনারেটর আছে বলে এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, কিন্তু আমরা বারান্দায় সব আলো নিভিয়ে দিলাম। চাঁদের আলোয় গাছের ছায়া পড়েছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে এবং তার মাঝে আমরা চুপচাপ বসে আছি, সে যে কী চমৎকার একটা অনুভূতি বুঝিয়ে বলা যাবে না। খালেদের আম্মা বললেন, "তৃণা মা, তুমি তো খুব সুন্দর গান গাইতে পারো। আমাদের একটা গান শোনও!"

আমি নিশ্চিত আমরা বললে কোনদিনও তৃণা গান গেয়ে শোনাতো না কিন্তু খালেদের আম্মাকে না করতে পারল না। সে আমাদের অনেকগুলো গান গেয়ে শোনালো, আম্মার যন্ত্রণায় আমাকে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে হয় কাজেই গানগুলো আমি আগেও শুনেছি কিন্তু এই জোছনা রাতে আধো-আলো, আধো-ছায়াতে শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন পরিবেশে গানগুলো শুনে আমার অন্যরকম লাগতে থাকে। বিশেষ করে জোছনা রাতে বনে যাওয়া নিয়ে গানটি শুনে মনে হলো রবীন্দ্রনাথ গানটি ঠিক যেন আমাদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন।

তৃণার গান শেষ হবার পরও আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। একসময় রামলাল জানালো টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে এবং আমরা হঠাৎ করে টের পেলাম খুব খিদে পেয়েছে। আমার কখনোই খুব খিদে পায় না, কিন্তু এখানে এসে কী হলো বুঝতে পারছি না, এতো খাবার পরেও দেখি একটু পর পর খিদে পেয়ে যাচ্ছে।

শিক কাবাব এবং পরোটা দিয়ে রাতের খাবারটা হলো একেবারে ফাটাফাটি আমরা আবার রাক্ষসের মতো খেলাম। খাওয়ার পর চা খেতে খেতে আমরা আবার বারান্দায় বসেছি। হেনা এসে খানিকক্ষণ আমাদের সাথে কথা বলে কুণ্ঠিতভাবে খালেদের আম্মাকে বলল, "খালাম্মা এখোন আমি যাই? ছেলেমেয়ে দুইটা একলা আছে।"

আমাদের হঠাৎ মনে পড়লো যে তারও দু'জন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের সেবা করতে করতে সে তার নিজের বাচ্চাদের কাছে যেতে পারছে না! আমার এতো খারাপ লাগল যে বলার মতো নয়। খালেদের আম্মা বললেন, "তোর বাচ্চারা একলা কেন? বাচ্চাদের বাপ কই?"

হেনা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "বাপের কোথা বোলবেন না। ব্যাটা রসের নাগড়, রং করতে কতো জায়গায় যায়! বাড়িতে থাকে নাকি?"

"থাক থাক আর বলতে হবে না। যা বাড়ি যা।"

হেনা চলে যাবার পরও আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। রাত্রি বেলা যখন বিছানায় শুয়েছি তখন ঘুম আসতে অনেক সময় লাগল। ঠিক জানি না কেন, শুয়ে শুয়ে

আমার হেনার বাচ্চাদের কথা মনে পড়ল। হেনার বাচ্চাদের আমি দেখিনি কিন্তু তাদের সাথে আমার কোথায় জানি একটা মিল আছে!

চা বাগানের বেড়ানো শেষ এখন আমাদের ফিরে যাবার পালা। একটু আগে আমরা খেয়ে নিয়েছি। ব্যাগ গুছিয়ে এখন ধীরে–সুস্থে গাড়িতে উঠব। খালেদ তখন তার আম্মাকে বলল, "আম্মু, তুমি ম্যানেজার সাহেবের বাসায় দেখা করলে না?"

খালেদের আম্মা বললেন, "যাবার সময় দেখা করে যাব।"

খালেদ বলল, "না, না আম্মু তুমি এখন যাও, আমরা যাবার সময় তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।"

আমার মনে হলো খালেদের আম্মা ঠিক যেতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু খালেদ প্রায় জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিল। আমরা আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি তখন কেয়ারটেকার মাজহার এসে হাজির হলো। সে প্রেমচাঁদ, রামলাল আর হেনাকে ডেকে বলল, "তোরা এখন যা।"

হেনা অবাক হয়ে বলল, "এখন কেন যাবো? ছোট সাহেবরা গেলে ঘরদোর পরিষ্কার করে যাবো।"

মাজহার দাঁত–মুখ খিচিয়ে বলল, "মুখের ওপর কথা বলিস—এত বড় সাহস? যা ভাগ।"

হেনা আর কিছু বলার সাহস পেলো না। রামলাল বলল, "বাবু, ঘরের তালা—"

মাজহার হুংকার দিয়ে বলল, "চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো। বের হ এখান থেকে।"

কাজেই আমরা দেখলাম তিনজন মুখ কালো করে চলে যাচ্ছে। লোকটা এমন করছে কেন কিছুই বুঝতে পারলাম না—একজন মানুষ কেমন করে আরেকজনের সাথে এতো খারাপ ব্যবহার করতে পারে?

আমরা যখন ব্যাগ গুছিয়ে এনেছি তখন খালেদ আমাদের ডাকল, বলল, "তোরা আয়, একটা জিনিস দেখাই।"

"কি জিনিস?"

"খুব ইন্টারেস্টিং।"

আমরা খালেদের পিছুপিছু গেলাম, সে গেস্ট হাউজের একবারের শেষ মাথার ঘরে গিয়ে কার্পেট তুলে বলল, "এই দেখ।"

মনে হলো ঘরের মেঝের একটা জায়গা একটা দরজার মতো। খালেদ একটা কোণা ধরে টান দিতেই সেটা ডালার মতো খুলে গেল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম একটা সিঁড়ির মতো নিচে নেমে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী এটা?"

"চোরা কুঠুরি! আগে যখন ইংরেজ সাহেবরা থাকতো মানুষজনকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে এইখানে আটকে রাখতো। না খেয়ে খেয়ে মানুষ মারা যেতো।"

আমরা অবাক হয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম, সিঁড়িটা প্রায় এক মানুষ নিচে নেমে গেছে। খালেদ বলল, "নিচে নামবি?"

সুমি বলল, "না বাপু দরকার নাই।"

আমি বললাম, "আয় না দেখে আসি।"

সুমি বলল, "না, না, আমার ভয় করে।"

"কী জিনিস ভয় করে?"

"সাপটাপ যদি থাকে?"

"ধুর! সাপ কোথা থেকে আসবে? এটা শীতকাল না?"

খালেদ বলল, "নিচে আয় দেখবি আরো কতো ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে।"

খালেদের পীড়াপীড়িতে আমরা একজন একজন করে নিচে নামতে থাকি। নিচে একটা ছোট ঘরের মতো, ইটের স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল। উপর থেকে অল্প কিছু আলো এসে ঘরটাকে এখানে রহস্যময় দেখাচ্ছে। এই প্রাচীন ছোট ঘরটাতে না জানি কতো রহস্য লুকিয়ে আছে। কতো মানুষকেই না জানি এখানে খুন করে ইংরেজ সাহেবরা পুঁতে ফেলেছিল।

তৃণা বলল, "দেখা হয়েছে চল যাই।"

সে যখন সিঁড়িতে পা দিয়েছে ঠিক তখন উপর থেকে কে যেন ধরাম করে ডালার মতোন দরজাটা বন্ধ করে দিল—মুহূর্তে চোরা কুঠুরিটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা এতো চমকে উঠলাম যে কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলাম না। শারমিন ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কে? কে বন্ধ করেছে?"

আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম উপরে কেউ একজন ডালার মতো দরজাটিতে ছিটকিনি মেরে দিচ্ছে। কিংশুক চিৎকার করে বলল, "কে? কে তালা মারছে?"

তৃণা ভাঙ্গা গলায় বলল, "খালেদ? কী হচ্ছে এখানে?"

খালেদ বলল, "আমি তো জানি না।"

এক বিচিত্র ভয়ে আমার বুকটা ধক ধক করতে শুরু করল। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, "তোরা কেউ ভয় পাবি না। কেউ নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে।"

"ঠাট্টা?" তৃণা বলল, "ঠাট্টা কেন করবে? এটা কী রকম ঠাট্টা?"

সুমি কাঁদো গলায় বলল, "আমার অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তোদের কারো কাছে টর্চ লাইট আছে।"

আমরা হঠাৎ করে শুনতে পেলাম চোরা কুঠুরীর ভেতরে অন্ধকারে কে যেন হা হা করে হাসতে শুরু করেছে।

অন্ধকারে আমরা সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। ভয়ে-আতংকে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কে হাসছে এখানে? ইফতি কাঁপা গলায় বলল, "কে?"

অন্ধকারে কে জানি ভারি গলায় বলল, "আমি তোমার বাবা।" গলার স্বরটি পরিচিত কিন্তু চিনতে পারলাম না।

খস করে একটা শব্দ হলো এবং দেখলাম ঘরের এক কোনায় ম্যাচের কাঠি জ্বলেছে, অন্ধকারে এই ম্যাচের কাঠিকেই মনে হলো অনেক আলো, সেই আলোতে দেখলাম ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার মাজহার দাঁড়িয়ে আছে। পুরো ব্যাপারটিকে একটা ঠাট্টা বলা যেতো, কিন্তু মাজহারের হাতে একটা ধারালো চকচকে রামদা। মানুষটা তার ভয়ংকর চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। ম্যাচের কাঠিটা ছোট হয়ে নিভে গেলে

আবার ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি অনেক কষ্ট করে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "কী হচ্ছে এখানে?"

মানুষটা আবার হা হা করে হেসে বলল, "খুব মজা হচ্ছে!"

"কী বলছেন আপনি?"

"আসল মজা এখনো শুরু হয় নি— শুরু হবে। এইটা মজার প্রিপারেশান।"

আমি টের পেলাম অন্ধকারে কেউ একজন আমার হাত ধরে ফেলেছে, ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, সম্ভবত তৃণা। আমি বললাম, "আমাদেরকে বাইরে যেতে দেন।"

আবার একটি ম্যাচের কাঠি জ্বললো, ম্যাচের কাঠির আলোতে মানুষটাকে এবারে আরো ভয়ংকর দেখায়। মানুষটা এবারে পকেট থেকে ছোট একটা মোমবাতি বের করে সেটা জ্বালিয়ে দেয়ালের একটা ইটে বসিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে একটা ব্যাগ তুলে নেয়। ব্যাগের ভেতর থেকে একটা নাইলনের দড়ির গোছা বের করে সে আমাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই যে ছেমড়িরা তোরা সবাই একটা করে ছেমড়ার হাত শক্ত করে বাঁধ।"

মাজাহার কী বলছে কেউ ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারল না, সবাই অবাক হয়ে মাজহারের দিকে তাকিয়ে রইল, তখন সে চিৎকার করে বলল, "কথা কানে যায় না?"

শারমিন এবার কাঁদতে শুরু করে। মাজহার হুংকার দিয়ে বলল, "এই ছেমড়ি? কাঁদবি তো মাথা ভেঙ্গে ফেলব। চোপ।"

শারমিন চুপ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে।

"ছ্যামড়াগুলোর হাত পেছনে নিয়ে শক্ত করে বাঁধা না হলে জবাই করে ফেলব।"

খালেদ সবার আগে দুই হাত পেছনে নিয়ে তৃণাকে ফিসফিস করে বলল, "বেঁধে ফেল।"

তৃণা, শারমিন আর সুমি ভয়ে ভয়ে আমাদের চারজনের হাঁত বাধল। তখন মাজহার এগিয়ে এসে বলল, "দেখি তোদের হাত—"

সুমি, শারমিন আর তৃণা তাদের হাত পেছনে নেয় এবং মানুষটা কিছুক্ষণেই তাদের হাত, শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

আমাদের সবার হাতের বাঁধন ভাল করে পরীক্ষা করে ওপরের দিকে মুখ তুলে গলা উঁচিয়ে বলল, "কাসেম। কাজ কমপ্লিট।"

ওপরে খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো এবং প্রায় সাথে সাথে ডালাটা খুলে কাসেম ভেতরে উঁকি দিল । ভেতরে আমাদের বাঁধা অবস্থায় দেখে গলায় সন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে বলল, "চমৎকার।"

মাজহার বলল, "এই কয়টা ইঁদুরের বাচ্চাকে ধরতে তোর এতো ভয়! আমাকে আসতে হলো।"

কাসেম বলল, "দোস্ত! তোর শরীর হচ্ছে মোষের শরীর। এই সব কাজ তোর করাই ভাল। আমি করব ব্রেনের কাজ।"

"কী অবস্থা তোর ব্রেনের কাজের?"

কাসেম কান পেতে কিছু একটা শুনে বলল, "ঐ শোন, মাইক্রোবাস ছেড়ে দিল।"

ইফতি ভয়ে ভয়ে বলল, "ছেড়ে দিল?"

"হ্যাঁ! তোমাদের নিয়ে সেটা এখন ঢাকা যাচ্ছে।"

"আমাদের নিয়ে?"

"হ্যাঁ। চা বাগানের সবাই জানবে তোমরা ঢাকা রওনা দিয়ে দিয়েছ।"

কিংশুক বলল, "মাইক্রোবাস খালি। যে কেউ দেখলেই বুঝবে—"

কাসেম খ্যাক খ্যাক করে হেসে নিজের মাথায় ঠোকা দিয়ে বলল, "এই ব্রেন দিয়ে সব ঠিক করেছি। পর্দাওয়ালা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছি কী জন্যে? পর্দা টানা থাকবে, কেউ জানবে না ভেতরে কেউ নাই!"

"কিন্তু–কিন্তু–" আমি ইতস্তত করে বললাম, "খালেদের আম্মু যখন দেখবে—"

কাসেম চোরা কুঠুরির সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নিচে নেমে বলল, "সেইটার জন্যেই তো তোমাদের এখানে এনেছি। একটু পরেই খালেদের আম্মা খোঁজ নিতে এখানে এসে দেখবে কেউ নাই, সবাই ঢাকা চলে গেছে। তখন যেন তোমরা চেঁচামেচি না কর সেই জন্যে এখন তোমাদের মুখে টেপ মেরে দেবো। এই দ্যাখো—"

কাসেম ব্যাগ থেকে বড় এক ধরনের টেপ বের করে আমাদের দেখালো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বলল, "কখন খালেদের আম্মা চলে আসবে তার কোন ঠিক নাই। এখনই তোমাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া যাক!"

আমরা কী করব বুঝতে পারলাম না, হাত পেছনে বাঁধা, নড়ার উপায় নেই। সেই অবস্থার আমাদের সবার মুখে কাসেম বড় টেপ লাগিয়ে দিল। এখন আমাদের মুখ দিয়ে শব্দ করারও কোন উপায় নাই।

কাসেম এবারে মাজহারের দিকে তাকিয়ে বলল, "দোস্ত! তুই এখন উপরে যা। এদের ব্যাগগুলো নিয়ে আয়। এখানে রাখি। খালেদের মা এলে সামাল দিস। আমি নিচে পাহারায় আছি।"

"দেখিস কোন শব্দ যেন না করে। পুরো প্ল্যানটা কিন্তু এর ওপরে নির্ভর করছে।"

কাসেম দাঁত বের করে হাসল, বলল, "সেইটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে!"

মাজহার চোরা কুঠুরি দিয়ে বের হয়ে আমাদের ব্যাগগুলো নিচে নিয়ে এলো। তারপর উপর থেকে ডালার মতো দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ডালার উপরটুকু কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে এখন কেউ জানবেও না এখানে একটা চোরা কুঠুরি আছে আর সেই চোরা কুঠুরির মাঝে আমরা আটকা পড়ে আছি।

আমরা কতোক্ষণ এভাবে আটকা পড়েছিলাম কে জানে, মনে হলো বুঝি কয়েক যুগ। হাত পেছন দিয়ে বাঁধা। মনে হচ্ছে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুখ বন্ধ করে রাখলে শুধু মনে হয় বুঝি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলাম, অন্যদের কী অবস্থা কে জানে। আমি সবার চোখে চোখ রেখে তাদের সাহস দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

যখন আমাদের অবস্থা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল তখন হঠাৎ করে উপরে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। কাসেম তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তৃণাকে নিজের দিকে টেনে এনে তার বাম হাতের একটা আঙুল সিঁড়ির উপরে রেখে তার উপর রাম দা'টা ধরে বলল, "তোরা কেউ একটা শব্দ করবি তো এই মেয়ের বাম হাতের কেনি আঙুলটা এক কোপ দিয়ে আলাদা করে দেবো। বেশি না একটা মাত্র আঙুল! মনে থাকবে?"

আমরা মাথা নাড়লাম, তৃণার দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না, ভয়ে তার সারা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ঠিক তখন আমরা উপরে খালেদের আম্মার কথা শুনতে পেলাম, অবাক হয়ে বলছেন "কী বলছ তুমি চলে গেছে?"

আমরা মাজহারের গলার স্বর শুনতে পেলাম। "জী বেগম সাহেব। সবাই ঢাকা রওনা দিয়ে দিয়েছে।"

"আমাকে না তুলে নেবার কথা?"

"কে এসে খবর দিল আপনি নাকী ম্যানেজার সাহেবের বেগম সাহেবার সাথে ট্রেনে ঢাকা যাবেন। তাই শুনে কেউ দেরি করল না।"

"এটা কেমন করে হয়? কে বলেছে?"

"একটা কুলি এসে খবর দিল।"

"কেন?"

"তাতো জানি না। এই কুলিদের কথা বলবেন না। অশিক্ষিত মূর্খ! কার কথা কাকে বলেছে, কী বলতে কী বলেছে! আমাদের যে কী অসুবিধা হয় চিন্তা করতে পারবেন না। বোকা গাধাটাকে পেয়ে নিই টাইট করে ছেড়ে দেব।"

"এখন কী হবে? আমি ঢাকা যাব কেমন করে?"

"আপনি চিন্তা করবেন না—দুপুরে ট্রেন আছে। আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব। বাচ্চারা যাওয়ার আগে আপনি ঢাকা পৌঁছে যাবেন।"

"কী রকম গাধা ছেলেমেয়ে দেখো! এতজন মানুষের মাঝে একজনের মাথাতেও এলো না যে ম্যানেজারের বাসাটা দেখে যাই। এটা কী সম্ভব যে আমি তাদের ছেড়ে একা চলে যাব?"

মাজহার বলল, "আমিও তো তাই বললাম, কেউ আমার কথা শুনল না! আজকালকার ছেলেমেয়ে অন্যরকম।"

আমরা নিচে থেকে শুনতে পেলাম খালেদের আম্মা আর মাজহার কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন, এখানে থেকে বের হওয়ার শেষ আশাটুকুও তার সাথে চলে গেলো।

কাসেম আরো মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডালার মতো দরজাটা খুলে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে মাথা ঢুকিয়ে বলল, "এবার তোমরা উপরে আসতে পার! আর কোন ভয় নাই। চেষ্টাচরিত্র করে একজন আরেকজনকে খুলে দাও!"

পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় আমরা অনেক কষ্ট করে কিংশুকের হাতের বাঁধন খুলে দিলাম। সে তখন প্রথমে আমাদের মুখের টেপ খুলে দেয় তারপর একজন একজন করে সবার হাতের বাঁধন খুলে দিতে থাকে। আমরা আমাদের হাতের কব্জিতে হাত বুলাতে বুলাতে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। কিংশুক খালেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হচ্ছে এখানে?"

খালেদ কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কী জানি!"

"কী জানি মানে? তোদের ম্যানেজার তুই জানিস না?"

"আমি কেমন করে জানব?"

আমি বললাম, "আহ্ ঝগড়া করিস না তো! আয় উপরে। ফ্রেশ বাতাসে আগে নিঃশ্বাস নেই।"

আমরা চোরা কুঠুরি থেকে বের হয়ে এলাম। তৃণা গিয়ে বাইরের দরজাটা খোলার চেষ্টা করে দেখলো সেটাতে তালা লাগানো। বাইরে কাছেই কাসেম দাঁড়িয়েছিল, বলল, "তোমরা এখন ভেতরে রিলাক্স করো। সময় হলেই ছেড়ে দিব!"

ইফতি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমাদের ধরেছ কেন?"

"একটা কারণ তো আছেই!"

"কী কারণ।"

"সময় হলেই জানবে।" বলে কাসেম হেঁটে হেঁটে একটা গাছের নিচে বসে সিগারেট খেতে লাগল।

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, সবাই ভয় পেয়েছে, ভাল করে মনে হয় কথাও বলতে পারছে না। বেশি ভয়ও পায় নি। আমরা যখন কী করব তার কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না তখন খালেদ বলল, "তোরা ভয় পাবি না।"

শারমিন বলল, "ভয় পাব না?"

"না।"

সুমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, " কেন ভয় পাবো না?"

"কারণ আমি তোদের সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।"

আমরা অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম, বলে কী ছেলেটা! কিংশুক জিজ্ঞেস করল, " কেমন করে উদ্ধার করবি?"

খালেদ গম্ভীর মুখে বলল, "আয় দেখাই।"

আমরা খালেদের পিছু পিছু গেলাম, সে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এই দ্যাখ সব জানালার শিক লাগানো আছে।"

আমরা মাথা নাড়লাম।

খালেদ গম্ভীর মুখে বলল, "তার মানে কী জানিস?"

"কী?"

"আমাদের দরকার একটা হ্যাক স। একটা হ্যাক স থাকলেই এই শিকটা কেটে বাকা করে বের হয়ে যাব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাক-স টা পাবি কোথায়?"

"খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আয় খুঁজি।"

এরকম কথা আমি আগে কখনো শুনি নি যে খুঁজলেই হ্যাক-স পাওয়া যাবে। খালেদ যে রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে খুঁজতে শুরু করল যে আমি একটু অবাকই হলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, "এই ক্লজেটের উপরে দেখ দেখি।"

তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে কোনভাবে জানে এখানে একটা হ্যাক-স আছে কিন্তু দেখা গেল সেখানে কিছু নেই। মনে হলো খালেদ খুব অবাক হয়ে গেল সে বেশ কয়েকবার খুঁজে কেমন জানি রেগে গেল। আমি বললাম, "কী হয়েছে খালেদ?"

"কিছু হয় নাই।"

"তোর ভাবভঙ্গি যেন কেমন! তুই কী কিছু জানিস যেটা আমরা জানি না?"

খালেদ ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই কী বলতে চাইছিস?"

"আমি কিছু বলতে চাইছি না। মনে হচ্ছে তুই কিছু একটা বলতে চাইছিস।"

খালেদ কিছুক্ষণ রাগ হয়ে আমাদের দিকে তাকাল তারপর তাকে কেমন জানি অপরাধীর মতো দেখাতে লাগল। খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে হঠাৎ বোকার মতো জোর করে হেসে উঠল। আমরা সবাই অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। খালেদ জোর করে খানিকক্ষণ হেসে বলল, "তোরা বুঝতে পারিস নি?"

"কী বুঝতে পারি নি?

"পুরো ব্যাপারটা একটা ঠাট্টা!"

আমরা অবাক হয়ে খালেদের দিকে তাকালাম, খালেদ বলল, "কাসেম ভাইয়ের সাথে প্ল্যান করে করেছি তোদের বোকা বানাবার জন্যে!"

আমরা আমাদের নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, এই পুরো ব্যাপারটি একটা ঠাট্টা? মানুষ কখনো এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করে?

খালেদ তখনো জোর করে হাসার চেষ্টা করছে, মুখে এক রকম দেঁতো হাসি হেসে বলল, "কাসেম ভাইকে বলেছিলাম এই ক্লজেটের উপর একটা হ্যাক-স রাখতে। কাসেম ভাই ভুলে গেছে!"

আমার কিছুক্ষণ লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। যখন বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে এতো রাগ উঠে গেল যে মনে হলো খালেদের মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। আমি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেও পারলাম না, খালেদের দিকে ছুটে গিয়ে তার বুকের কাপড় ধরে এক ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালের সাথে ঠেসে চেপে ধরে হিংস্র গলায় বললাম, "এটা একটা ঠাট্টা? এরকম জিনিস নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে?"

"আরে! তুই ঠাট্টাও বুঝিস না?" খালেদ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী করছিস তুই?"

আমি তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি, এক ঘুষিতে ওর মুখের দুইটা দাঁত ফেলে দেবার জন্যে হাত তুলে চিৎকার করে বললাম, "তোকে আমি খুন করে ফেলব।"

আমি সত্যিই মনে হয় খালেদকে খুন করে ফেলতাম কিন্তু তখন তৃণা পেছন থেকে ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলল, "ছেড়ে দে কাজল! ওকে মারিস না। মেরে লাভ নেই।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "কী বলছিস লাভ নেই। এর মুখের সব কয়টা দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। এই বেকুবের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার।"

কিংশুক বলল, "তৃণা কাজলকে ছেড়ে দে। একটু মার দিক। খালেদের একটু মার খাওয়া দরকার—"

"না।" তৃণা আমাকে টেনে সরিয়ে আনল।" বলল, "মার দিয়ে কোন লাভ হয় না।"

আমি রাগে ফোঁস ফোঁস করে খালেদকে বললাম, "অনেক ঠাট্টা হয়েছে। এখন তোর কাসেম ভাইকে বল দরজা খুলে দিতে।"

খালেদ কাঁদো কাঁদো একরকম মুখ করে জানালার কাছে গিয়ে ভাঙ্গা গলায় ডাকল, "কাসেম ভাই।"

গাছের নিচে বসে থাকা কাসেম মাথা ঘুরিয়ে বলল, "কী হয়েছে।"

"আপনাকে বললাম হ্যাক–সটা রাখতে, রাখলেন না কেন?"

"ভুল হয়ে গেছে।"

"ভুল হওয়া ঠিক হয় নাই। খালেদ রেগে বলল, " এখন এসে দরজা খুলে দেন।"

কাসেম উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে হেঁটে আমাদের কাছে এসে খালেদকে বলল, "প্ল্যানের একটু পরিবর্তন হয়েছে।"

খালেদ ঠিক বুঝতে পারল না, বলল, "কী পরিবর্তন হয়েছে?"

"আমাদের প্ল্যানের।"

"মানে?"

"মানে তোমাদের ছাড়া যাবে না— আসলেই তোমাদের ধরেছি! এইটা আর ঠাট্টা নাই। এইটা আসলেই সিরিয়াস।"

কাসেম কী বলছে খালেদ মনে হয় ঠিক বুঝতে পালল না কিন্তু আমার বুঝতে একটুও দেরি হলো না। খালেদ বোকার মতো বলল, "কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি।" কাসেম দাঁত বের করে হেসে বলল, "একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করতে জান বের হয়ে যায়—আমরা কিডন্যাপ করলাম সাতজনকে!" কাসেম তার হলুদ দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বলল, "মজাটা দেখেছো। আমাদের কিছু করাও লাগল না, তোমরা নিজেরা নিজেরা কিডন্যাপ হয়ে গেলে! হা–হা–হা!"

খালেদ বিস্ফারিত চোখে কাসেমের দিকে তাকিয়ে রইল, আমরা তাকিয়ে রইলাম খালেদের দিকে। আমাদের আবার ইচ্ছে করল টেনে খালেদের মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলতে।

তৃণার হাতটা টেনে তার কেনো আঙুলটা জানালার উপরে রেখে তার উপরে রামদা'টা বসিয়েছে কাসেম। মাজহার একটা মোবাইল টেলিফোন হাতে নিয়ে ডায়াল করতে গিয়ে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে কাজল, তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনো। তোমার বাবাকে আমি ফোন করে কিছু কথাবার্তা বলে আমি তোমারে ফোনটা দেবো। তুমি খালি দুইটা কথা বলবে। এক : বলবে আমি ভাল আছি। দুই : বলবে যা চায় তাই দিয়ে দাও। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম। মাজহার বলল, "যদি এই দুইটা কথার বাইরে আরো কিছু বলো তাহলে এই মেয়ের কেনে আঙুলটা আলগা করে ফেলব। মনে থাকবে?"

আমি মাথা নাড়লাম। মাজহার তখন মোবাইল টেলিফোনে নাম্বার ডায়াল করতে শুরু করল, কয়েকবার চেষ্টা করে সে আব্বুকে পেয়ে গেলো মনে হলো। টেলিফোন কানে লাগিয়ে বলল, "আলতাফ নবী সাহেব, আমি যেটা বলি সেটা খুব মন দিয়ে শুনেন। ব্যাপারটা খুব জরুরি, আপনার ছেলের বিষয়ে। আমি দেরি করবো না খুব তাড়াতাড়ি বলে দেবো।" মাজহার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আপনার ছেলেকে আমরা কিডন্যাপ করেছি। আমার সামনেই আছে। টি গার্ডেন থেকে যখন ঢাকা ফিরে যাচ্ছিল তখন রাস্তা থেকে ধরেছি। নরসীংদির কাছাকাছি এক জায়গায় আটকে রেখেছি।"

মাজহার লোকটা খুব গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলছে। আব্বু কী বললেন শুনতে পেলাম না। মাজহার তার উত্তরে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে নেন আপনার ছেলের সাথে কথা বলেন।"

মাজহার আমার হাতে টেলিফোনটা ধরিয়ে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে বোঝালো একটু উনিশ–বিশ করলেই তৃণার আঙুলটা কেটে ফেলবে। আমি টেলিফোনটা কানে লাগাতেই শুনলাম আব্বু বললেন, "হ্যালো, কাজল?"

আমি বললাম, "আমি ভাল আছি আব্বু।"

আব্বু বললেন, "তুমি কতো ভাল আছো সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। খুব তো নাটক করে বের হয়ে গেলে, এখন? তোমার বাবার টাকা ছাড়া তুমি ছুটে বের হয়ে আসতে পারবে ? আব্বু গর্জন করে বললেন, "পারবে?"

দুটি বাক্য ছাড়া আমার অন্য কিছু বলা নিষেধ তাই আমি কিছু বললাম না। আব্বু বললেন, "এখন যদি শায়লার একটা শিক্ষা হয়। তোমাকে ছুটিয়ে আনার পর আমি কোর্টে যাব তোমার কাস্টডি নেয়ার জন্যে, বুঝেছ? তোমার এই স্টুপিড কিডন্যাপারদের আমার পক্ষ থেকে থ্যাংকস দিয়ে দিও। কোর্টে প্রমাণ করা খুব সোজা হবে যে তোমার মা তোমাকে প্রটেকশান দিতে পারে না। বুঝেছ আমি কী বলছি?"

আমি চুপ করে রইলাম। আব্বু বললেন, "কী চায় এই কিডন্যাপাররা?"

আমি আমার দ্বিতীয় বাক্যটি বললাম, "যা চায় দিয়ে দাও।" তারপর টেলিফোনটা মাজহারের দিকে এগিয়ে দিলাম।

মাজহার টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "শুনেছেন আপনার ছেলের কথা? এখন বিশ্বাস হলো?" আব্বু কিছু একটা বললেন তার উত্তরে মাজহার বললো "আমাদের ডিমান্ড খুবই কম। মাত্র তিরিশ লাখ টাকা। কবে দরকার? কাল ভোরে।" আব্বু কিছু একটা বললেন, তার উত্তরে মাজহার বলল, "কী বলছেন এক রাতে এতো ক্যাশ যোগাড় করতে পারবেন না। আপনি হচ্ছেন আলতাফ নবী, আপনার রুমাল ঝাড়লেই দশ লক্ষ বের হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে একটা কম্প্রমাইজ করা যাক, বিশ লাখ দেন। একশ টাকার নোটে। ঠিক আছে?"

আব্বু মনে হয়ে রাজি হয়ে গেলেন কারণ দেখতে পেলাম মাজহার খুব খুশি হয়ে গেল। সে সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "ঠিক সকাল আটটার সময় এয়ারপোর্ট রোডে একটা ইয়েলোক্যাব নিয়ে থাকব। গোল চত্বরের কাছে। বোঝা খুব সহজ হেড লাইট জ্বালানো থাকবে। একটা চটের ব্যাগে করে দেবেন। যদি কিছু উনিশ–বিশ করেন তাহলে আমি হয়তো ধরা পড়ব কিন্তু আপনার ছেলে শেষ হয়ে যাবে। তার মাথাটা ব্যাগে করে পাঠিয়ে দেব। কাটা।" মাজহার হা হা করে হাসল যেন সে ভারি মজার একটা রসিকতা করেছে। আব্বু মনে হয় কথা দিলেন যে কোন ঝামেলা করবেন না এবং মাজহার খুব খুশি হয়ে গেল। টেলিফোনটা বন্ধ করে মাজহার কাসেমকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করতেই সে তৃণার আঙুলটা ছেড়ে দিল। মাজহার জিব দিয়ে এক ধরনের শব্দ করে বলল, "টাকা রোজগার করা কত সোজা দেখেছিস? মাইক্রোবাস ড্রাইভার বিশ হাজার, ক্যাব ড্রাইভার বিশ হাজার। বাকি থাকল উনিশ লাখ ষাট হাজার। তুই নয় লক্ষ আশি হাজার আমি নয় লক্ষ আশি হাজার।"

মাজহার আর কাসেম সরে যেতেই আমি খালেদের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কী ভাবে জানল আমি আলতাফ নবীর ছেলে?"

কাজল আমতা আমতা করে বলল, "আমি বলেছিলাম ।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলাম, "দেখ খালেদ আমার আব্বুর এতো টাকা যে তোরা কখনও কল্পনাও করতে পারবি না। বিশ লাখ টাকা আব্বুর জন্যে কিছুই না। আমি আর আম্মু সবকিছু ছেড়েছুড়ে এসেছি। আমরা শুধু একটা জিনিস প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, টাকাই সবকিছু না। সেটা প্রমাণ করেও ফেলেছিলাম কিন্তু তোর জন্যে পারলাম না। এখন আমাকে বাঁচানোর জন্যে আব্বুর টাকা নিতে হবে। কতো টাকা? বিশ লাখ। বিশ লাখ আব্বুর জন্যে কোন টাকাই না—কিন্তু সেই টাকার জন্যে আব্বুর সামনে আমার আম্মু সারা জীবনের জন্যে ছোট হয়ে যাবে। সারা জীবনের জন্যে। বুঝেছিস?"

খালেদ কোন কথা না বলে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকালো, তার ত্যালত্যালে মুখটা দেখে হঠাৎ রাগে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। নিজেকে আর সহ্য করতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে খালেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই খালেদ হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে গেল। আমি কলার চেপে হাত দিয়ে মুখে মারতে গেলাম, কিন্তু তৃণা পেছন থেকে ধরে ফেলল, বলল, "ছিঃ কাজল, কী করছিস?"

"এই চামচিকার বাচ্চাকে খুন করে ফেলছি।"

"না।" তৃণা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল "তোকে আমি সব সময় অন্য চোখে দেখি কাজল। তুই আমাদের লিডার। ওর গায়ে হাত তুললে তুই তো সাধারণ মানুষ হয়ে যাবি। আর লিডার থাকবি না।"

আমি তৃণার দিকে তাকালাম, তৃণা আমার দিকে তাকিয়ে কোমল ভঙ্গিতে হাসল। আমি খালেদের দিকে একবার তাকালাম তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খালেদের আমার ওপর হিংসা হয়েছে, তাই কিছু একটা বীরত্বপূর্ণ কাজ করে সবাইকে অবাক করে দিতে চাইছিল। কখনো বুঝতে পারে নি সেটা এরকম ভাবে মোড় নিবে। তৃণা সত্যিই বলেছে—এরকম অপদার্থ মানুষের গায়ে হাত তোলার কোন মানে হয় না।

আমরা গেস্ট হাউজে বন্দি হয়ে রইলাম। কাল ভোরে আব্বুর বিশ লাখ টাকা পাবার পর মাজহার হয়তো আব্বুকে জানাবে আমরা কোথায় আছি। তার আগে এখান থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। এই গেস্ট হাউজটি টিলার উপরে একেবারে আলাদা, দূর থেকে কেউ বুঝতেও পারবে না যে সাতজন ছেলেমেয়ে এখানে আটকা পড়ে আছে। আমরা পুরো গেস্ট হাউজটি তন্ন তন্ন করে দেখেছি, এখান থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। জানালায় নেট লাগানো। মানুষ দূরে থাকুক, একটা মশার পর্যন্ত বের হওয়ার উপায় নেই।

আমরা মনমরা হয়ে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে এলো। লাইট জ্বালাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম কাসেম আর মাজহার মেইন সুইচ বন্ধ করে রেখেছে, গেস্ট হাউজে কারো থাকার কথা নয় তাই সেখানে আলো জ্বালাতে দিতে চায় না। এখন অন্ধকারে বসে থাকতে হবে। সেই দুপর বেলা খেয়েছি, ধীরে ধীরে সবার খিদে পেয়ে গেল। রাতে আবার খেতে দেবে কী না কে জানে।

রাত আটটার দিকে কাসেম জানালা দিয়ে আমাদের জন্যে কিছু কলা আর পাউরুটি ধরিয়ে দিল। গত রাতেও আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে শিক-কাবাব আর পরোটা খেয়েছি

অথচ এখন এই শুকনো রুটি আর কলা। খেতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম রুটিগুলো বাসি তার মাঝে কেমন জানি টক টক গন্ধ। রুটি না খেয়ে কোনমতে কলাগুলো ভাগাভাগি করে খেয়ে বসে রইলাম। আমরা একটু পর পর ঘড়ি দেখছি, সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না। আমি বললাম, "আয় শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে গেলে সময় তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।"

সুমি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমার ঘুমই হবে না।"

"না হলেও চেষ্টা করে দেখ।"

কাজেই আমরা ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলাম। একজন একজন করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাথরুমে যাচ্ছে তার মাঝে হঠাৎ শারমিন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। আমরা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

শারমিন কাঁপা গলায় বলল, "এটা কী?"

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, জানালা দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো এসেছে সেটুকুই ভরসা। তার মাঝে মনে হলো একটা বেড়াল। গেস্ট হাউজেই থাকে, দিনের বেলাতেও এদিকে সেদিকে দেখেছি। ইফতি বলল, "এটা মনে হয় বেড়াল।"

কিংশুক বলল, "বাঘ তো হতে পারে না। বেড়ালই হবে।"

আমি হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, "দাঁড়া! এক সেকেন্ড দাঁড়া।"

"কী হয়েছে?

"বেড়ালটা তো বাইরে ছিল। ভেতরে এলো কেমন করে?"

তৃণা বলল, "ঠিকই তো। ভেতরে এলো কেমন করে। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "আমরা গেস্ট হাউজটা ভালভাবে দেখেছি একটা মশাও বের হতে পারবে না। তাহলে বেড়াল এসেছে কেমন করে?"

সুমি ভয় পেয়ে বলল, "তার মানে তুই বলছিস এটা বেড়াল না, অন্য কিছু?"

এত দুঃখেও আমার হাসি পেয়ে গেল, বললাম, "ধুর আমি তা বলছি না।"

"তাহলে কী বলছিস?"

"আমি বলছি বেড়ালের ভেতরে ঢোকার একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটা যদি একটু বড় হয় তাহলে আমরা বের হয়ে যেতে পারি।"

ইফতি হাতে কিল দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস! এক্কেবারে ঠিক।"

শারমিন বলল, "সেটা বের করবি কেমন করে?"

খালেদ গত কয়েক ঘণ্টায় কোন কথাবার্তা বলে নি। এবারে মুখ গোঁজ করে বলল, "বেড়াল তো আর কথা বলতে পারে না।"

আমি বললাম, "কথা বলতে হবে না। আমরা বেড়ালটাকে তাড়া করি। দেখি কোন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।"

তৃণা উত্তেজিত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস! তুই ঠিক বলেছিস।"

সুমি ইতস্তত করে বলল, "যে গর্ত দিয়ে বেড়াল বের হতে পারে আমরা সেদিক দিয়ে কেমন করে বের হবো?"

"আগে দেখা যাক তো কতো বড় গর্ত।"

তৃণা বলল, "অন্ধকারে খুব মুস্কিল হবে দেখা। একটা টর্চ লাইট থাকলে যা সুবিধে হতো!।

খালেদ দ্বিতীয়বার একটা কথা বলল, "আমার কাছে একটা ছোট টর্চ লাইট আছে!"

তৃণা বলল, "সেটা আগে বলবি তো! কতোক্ষণ থেকে অন্ধকারে বসে আছি।"

আমি বললাম, "দাঁড়া টর্চ লাইট জ্বালাতে খুব সাবধান। ওরা টের পেলে কেড়ে নেবে।"

ইফতি বলল, "হ্যাঁ, খুব সাবধান।'

আমি বললাম, "যা নিয়ে আয় টর্চ লাইটটা। আর বেড়ালটাকে চোখে চোখে রাখ, আগেই না চলে যায়।"

কিছুক্ষণের মাঝেই খালেদ তার টর্চ লাইটটা নিয়ে আমার হাতে দিলো, আমি সাবধানে নিচের দিকে জ্বালিয়ে একবার পরীক্ষা করে বললাম, "ঠিক আছে! এখন তাড়া কর বেড়ালটাকে।"

আমরা বেড়ালটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ধাওয়া করলাম, বেড়ালটা "ম্যাঁও" করে ডেকে একটু প্রতিবাদ করল, পোষা বেড়াল, মানুষকে ভয় পায় না। ইফতি বলল, "মনে হয় একটু লাথি দিতে হবে।"

তৃণা বলল, "না–না লাথি দিবি না, খবরদার।"

আমরা আবার বেড়ালটাকে ধাওয়া করলাম। তখন সেটা একটু ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে শুরু করল, আমরা তার পিছুপিছু গেলাম। ডাইনিং রুমে গিয়ে সেটা আরেকবার "ম্যাঁও" করে ডাকলো, আমরা আবার তাকে ধাওয়া করলাম তখন সেটা লাফিয়ে জানালায় উঠে অরেক লাফ দিয়ে ফ্রিজের উপর সেখান থেকে আরেক লাফ দিয়ে উপরে সিলিংয়ের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল! তৃণা উত্তেজিত গলায় বলল, "সিলিংয়ের ভেতর দিয়ে গেছে। সিলিংয়ের ভেতর দিয়ে!"

কিংশুক বলল, "এখন কী করবি?"

আমি বললাম, "উঠে দেখতে হবে।" আমি ফিসফিস করে বললাম, "সবাই এখানে থাকিস না। কয়েকজন বসার ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে থাক। কাসেম যেন বুঝতে পারে না আমরা এখানে।"

কিংশুক জানতে চাইল, "কে কে থাকব এখানে?"

কীভাবে কীভাবে জানি সবাই ধরে নিয়েছে আমিই সবকিছু ঠিক করে বলে দেবো অন্যেরা শুধু সেটা করবে। আমি বললাম, "ইফতি আর আমি এখানে থাকি, অন্যরা যা।"

একটু পরেই শুনলাম তারা বসার ঘরে কথাবার্তা বলছে। আমি সাবধানে ফ্রিজের উপরে উঠে উপরে সিলিংটা পরীক্ষা করলাম। দিনের বেলায় উপরে তাকাই নি, মনে হলো প্লাইউডের তৈরি। হাত দিয়ে চাপ দিতেই সরে গিয়ে জায়গা হয়ে গেলো। আমি খুব সাবধানে টর্চ লাইটটা জ্বালালাম, লোহার এঙ্গেল দিয়ে ফ্রেম তৈরি করে তার উপর প্লাইউড বসিয়ে সিলিং তৈরি হয়েছে। হালকা প্লাইউডে পা দিয়ে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। টাইলের ছাদ ফ্রেমের উপর বসানো, ঢালু হয়ে নিচে নেমে এসেছে। আমি বেড়ালটাকে খুঁজলাম এক কোনায় বসে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আমি হাত দিয়ে ঢিল ছোড়ার ভঙ্গি করতেই সেটা লাফ দিয়ে এক কোনায় গিয়ে একটা গর্ত দিয়ে বের হয়ে গেলো। আমি সাবধানে এগিয়ে গেলাম, উপরে ধুলোবালি এবং মাকড়শার জাল, ভয় হচ্ছে এঙ্গেলটা ভেঙে না আবার নিচে পড়ে যাই।

খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি এক কোনায় একটা টাইল ভাঙা সেই গর্ত দিয়ে বেড়ালটা বের হয়েছে। আমি মাথা ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম—মানুষ বের হবার জন্যে যথেষ্ট বড় নয়। টাইলগুলো ধরে নেড়ে দেখলাম নড়বড় করছে। সাবধানে আরেকটা টাইল ধরে টান দিতেই সেটা খুলে বের হয়ে এলো। এখন একজন মানুষ বের হয়ে যেতে পারে। সামনে ঢালু হয়ে ছাদ নেমে গেছে, ছাদের শেষ মাথা মাটি থেকে আট-দশ ফুট নিচু। লাফিয়ে নামা যাবে না। দড়ি ধরে ঝুলে নামতে হবে। একটু বুদ্ধি করলেই পালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

আমি আবার এ্যাঙ্গেলের উপর পা দিয়ে সাবধানে বের হয়ে এলাম। ইফতি জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা?"

"উপরে ভাঙা টাইলের ফাঁক দিয়ে বের হওয়া যাবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

ইফতি চকচকে চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, "একটা দড়ি লাগবে নামার জন্যে।"

"মনে নাই, নাইলনের দড়ি আছে—যেটা দিয়ে আমাদের বেঁধেছিল?"

"ঠিকই বলেছিস! চল কাজ শুরু করে দেই। দেরি করে লাভ নেই।"

আমি আর ইফতি বসার ঘরে যেতেই সবাই আমাদের ঘিরে ধরল, ফিসফিস করে জানতে চাইল, "কী অবস্থা?"

আমি খুলে বলতেই কিংশুক উত্তেজিত গলায় বলর, "ফ্যান্টাস্টিক!"

"হ্যাঁ। চল পালিয়ে যাই।"

খালেদ মিনমিন করে বলল, "মেয়েরা কী পারবে?"

তৃণা বলল, "তোর থেকে একশগুণ ভাল পারবে।"

কেউ তখন আর কোন কথা বলল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাসেম আর মাজহার কোথায়?"

"মাজহার নেই।" শারমিন বলল, "একটু আগে কাসেম বাইরের ঐ ঘরটায় ঢুকেছে।"

খালেদ মাথা নাড়ল, বলল, "ঐটা ড্রাইভারদের ঘর।"

"তার মানে কাসেম শুয়ে পড়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার। আয় তাহলে শুরু করে দেই।"

আমরা এবারে কাজ শুরু করলাম। আমি যেহেতু কী করতে হবে জানি কাজেই আমি গেলাম প্রথমে। এরপর যাবে ইফতি। ইফতির পর তৃণা। তৃণার পর খালেদ। খালেদের পর শারমিন, সুমি। সবশেষে কিংশুক। আমি নাইলনের দড়ির বান্ডিল নিয়ে উপরে উঠে গেলাম। সাবধানে ছাদের ফুটোর কাছে গিয়ে লোহার এঙ্গেলের সাথে বেঁধে দড়িগুলো নিচে নামিয়ে দিলাম। দুই প্রস্থ দড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে গিট মেরে দেয়া হয়েছে যেন পা রেখে নেমে যাওয়া যায়। আমি ফুটোর কাছে বসে ইফতিকে ডাকলাম, ইফতি বেড়ালের বাচ্চার মতো উপরে উঠে এলো। কোথায় পা দিয়ে আসতে হবে দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক সেইভাবে সে এগিয়ে এলো, সাবধানে ফুটো দিয়ে বের হয়ে ছাদের ঢাল দিয়ে নিচে নেমে দড়ি ধরে নেমে

গেলো। এরপর তৃণা—সেও দেখি খুব চমৎকারভাবে নেমে গেলো। এরপর খালেদ, তাকে নিয়ে বেশ একটু সমস্যা হলো, ভুল জায়গায় পা দেয়ায় প্লাইউড খুলে আর একটু হলে সিলিং থেকে নিচেই পড়ে যেতো। তবে তার ভুল করায় একটা লাভ হলো পরের সবাই সাবধান হয়ে গেল। শারমিন-সুমিকেও নামিয়ে দেয়া গেলো। কিংশুক নেমে যাবার পর আমিও নেমে নিচে এসে জড়ো হয়েছি।

কিংশুক আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক! তোর মাথায় পলিটিশিয়ানদের মতো ফিচলে বুদ্ধি।"

ইফতি বলল, "এটা ফিচলে বুদ্ধি না। একটা ভালো বুদ্ধি।"

তৃণা বলল, "কথা পরে হবে। এখন কী করব?"

কিংশুক বলল, "যত তাড়াতাড়ি পারি পালিয়ে যাই।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না। আগে কাসেমকে তার ঘরে আটকে ফেলা যাক।"

সুমি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কীভাবে?"

আমি নাইলনের দড়ি দেখিয়ে বললাম, "এটা দিয়ে দরজার কড়া বেঁধে ফেলা যাক যেন পালাতে না পারে।"

নাইলনের দড়িটা অবশ্যি উপরে বাঁধা সেটা খোলার উপায় নেই। দেয়ালে ঘষে ঘষে এক টুকরো ছিঁড়ে আমরা কাসেমের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পা টিপে টিপে দরজার কড়ায় যেই হাত দিয়েছি তখন একটু শব্দ হয়ে গেলো। ভেতর থেকে কাসেম বলল, "কে, মাজহার?"

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। বললাম, "উঁ।"

আমার চারপাশে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সবাই ভয়ে সিটিয়ে গেছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, "বের হতেই জাপটে ধরবি? ঠিক আছে?"

সবাই মাথা নাড়ল। শুনতে পেলাম ভেতর থেকে কাসেম বলছে, "এখন কী করছিস? তোর না ট্রেন ধরার কথা।" সে গজগজ করতে করতে এসে দরজা খুলতেই আমরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, কাসেম চিৎকার করে নিচে পড়ে গেলো, সবাই তার ওপরে চেপে বসেছে। ইফতি চুল ধরে বলল, "জবাই করে ফেলব এই হারামির বাচ্চাকে।"

"আপাতত পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেল।"

বারান্দায় দড়ি থেকে একটা গামছা ঝুলছে, সেটা দিয়ে হাত বেঁধে ফেলা হলো। কাসেম মনে হয় কিছু বুঝতে পারছে না— ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, "গেস্ট হাউজের চাবি কই?"

"আ-আ-আমি জানি না।"

ইফতি রাগে গরগর করে বলল, "এমনিতে বলবে না। সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিতে হবে।"

কিংশুক বলল, "মেয়েরা একটু বাইরে যাও।"

"কেন?"

"সিগারেট দিয়ে এই বদমাশের এমন জায়গায় ছ্যাঁকা দেব যে সে তোমাদের সামনে লজ্জা পেতে পারে।"

কাসেম এবারে ভয় পেয়ে ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করল। ইফতি হুংকার দিয়ে বলল, "কোথায় চাবি?"

"বালিশের নিচে।"

বালিশের নিচ থেকে চাবি নিয়ে গেস্ট হাউজের তালা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। কাসেমকে ঠেলে চোরা কুঠুরির ভেতরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম। বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বললাম, "চল যাই।"

"এখন কোথায় যাবি?"

খালেদ বলল, "ম্যানেজারের কাছে।"

আমি বললাম, "দেরি না হয়ে যায়।"

"কীসের দেরি?"

"আমার ঢাকা যেতে হবে। আব্বুর বিশ লাখ টাকা যেন মাজহারকে দিতে না হয়।"

ইফতি বলল, "ম্যানেজারের বাসা থেকে ফোন করে দেব।"

খালেদ বলল, "চা বাগানে ফোন থাকে না।"

"তাহলে?"

আমি বললাম, "ট্রেন ধরতে হবে। রাতের ট্রেন আছে না?"

সুমি ভয়ে ভয়ে বলল, "এখন ট্রেন ধরতে যাবি?"

অন্য কেউ কিছু বলার আগে তৃণা বলল, "হ্যাঁ। ট্রেন ধরতে হবে। ঢাকা গিয়ে মাজহারকে থামাতে হবে। এটা সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট। কাজল আর তার আম্মুর সম্মান বাঁচাতে হবে— যেন তার আব্বুর টাকা নিতে না হয়। বুঝেছিস?"

সবাই তখন এক সাথে মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা হঠাৎ করে সবাই বুঝতে পেরেছে। কাজেই কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা চা বাগানের রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলাম।

বড় রাস্তায় এসে একটা টেম্পো ধরে আমরা যখন শায়েস্তাগঞ্জ এসেছি ঠিক তখন ট্রেনটা ঢাকার দিকে ছেড়ে যাচ্ছে। টিকিট কাটার কোন সময় নেই। আমরা সেভাবেই ট্রেনে উঠে গেলাম—আর কোন ভয় নেই।

ট্রেনে বসার জায়গা নেই, সত্যি কথা বলতে কী দাঁড়ানোর জায়গাও নেই। আমরা বসার জায়গার জন্যে যখন এক বগি থেকে আরেক বগিতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে ইফতি চাপা গলায় বলল, "সাবধান!"

"কী হয়েছে?"

"মাজহার।"

"কোথায়?"

"ঐ দেখ—বসে আছে।"

আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই সে মাঝামাঝি এক জায়গায় বসে আছে। মুখ গম্ভীর, কিছু একটা নিয়ে খুব ভাবনা করছে। আমরা আর সামনে অগ্রসর হলাম না, পিছিয়ে অন্য বগিতে চলে এলাম।

ট্রেনে টিকেট চেকার এলে কী বলব জানি না, খুব বেশি প্রয়োজন হলে সত্যি কথাই বলা যাবে কিন্তু টিকেট চেকার এতো রাতে টিকেট চেক করতে এলো না। আমরা বিনা টিকেটের যাত্রীরা কয়েকটা খালি সিটে বসে গুটিশুটি মেরে বসে কাটিয়ে দিলাম। কারো চোখে ঘুম আসছে না—ফিসফিস করে কথা বলছি। মনে হলো ঢাকায় বুঝি আর কোন দিন পৌঁছাব না। বসে থাকতে মাঝে মাঝে চোখে ঢুলুনি এসে যাচ্ছে তখন আবার চমকে জেগে উঠছি।

খুব ভোরে ট্রেনটা এয়ারপোর্ট স্টেশনে থামল। সবাই নেমে যাবার পর আমরা নেমে এলাম। কিংশুক জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন বের হবো কেমন করে? টিকিট নেই গেটে ধরবে না?"

ইফতি বলল, "চুপচাপ স্টেশনে বসে থাক। যখন সব লোক বের হয়ে যাবে, গেটে কেউ থাকবে না তখন বের হবো। সত্যি সত্যি মিনিট পনেরোর ভেতর সব খালি হয়ে গেলো, আমরা তখন হেঁটে বের হয়ে এলাম। আটটার সময় মাজহার একটা ইয়েলো ক্যাব নিয়ে এয়ারপোর্টের সামনে গোল চত্বরে যাবে। আমাদের তার আগেই সেখানে পৌঁছাতে হবে।

স্টেশন থেকে খুব কাছে এয়ারপোর্টের গোল চত্বরে—আমরা হেঁটেই চলে এলাম। এখন শুধু অপেক্ষা করা— কী করতে হবে সেটা নিজেরা ঠিক করে নিয়ে শুধু অপেক্ষা করা। রাত জেগে না খেয়ে আমাদের একেকজনের চেহারা হয়েছে কাকতাড়ুয়ার মতোন—এক সাথে সাতজন কাকতাড়ুয়া ছেলেমেয়ে ফুটপাতের রেলিংয়ে বসে আছে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে, তাই আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলাম। আমি আর তৃণা এক-জায়গায়। সুমি শারমিন এক জায়গায়। ইফতি কিংশুক এক জায়গায়—এবং খালেদ একা এক জায়গায়। সে নিজেই একা একা বসতে চেয়েছে।

আমি আর তৃণা চুপচাপ বসে আছি, সময় আর কাটতে চায় না। সাড়ে সাতটার দিকে বেশ দূরে এক জায়গায় একটা গাড়ি এসে থামল। আমি গাড়িটাকে চিনতে পারলাম, এটার পেছনে আমার গাড়ি আমি এটা দিয়ে স্কুলে যেতাম। ড্রাইভার চাচা চালাচ্ছে। পিছনে আব্বু বসে আছে। আমি তৃণাকে ফিসফিস করে বললাম, "আমার আব্বু টাকা নিয়ে চলে এসেছেন।"

"কোথায়?"

"ঐ যে রাস্তার পাশে। গাড়ির পেছনে আব্বু বসে আছেন।" আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম, এখন আমাকে দেখে ফেললে খুব মুস্কিল হয়ে যাবে।

ঢাকা শহর মনে হয় কখনো বিশ্রাম নেয় না। এই ভোর বেলায় কত গাড়ি টেম্পো বাস। শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। গার্মেন্টসের মেয়েরা কথা বলতে বলতে কাজে যাচ্ছে, মানুষজন অফিস যাচ্ছে, ছোট বাচ্চারা ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তার মাঝে আমরা কয়জন চুপ করে বসে আছি।

আটটা বাজার ঠিক দুই মিনিট পর একটা ইয়েলো ক্যাব উত্তরার দিক থেকে আসতে শুরু করল, হেড লাইট জ্বলছে, তার মানে এর মাঝেই নিশ্চয়ই মাজহার বসে আছে।

উত্তেজনায় আমার দাঁড়িয়ে যাবার ইচ্ছে করল কিন্তু অনেক কষ্ট করে আমি বসে রইলাম। ক্যাবটা একটু দূরে এসে থামল। আমি দেখলাম ড্রাইভার চাচা একটা বড় ব্যাগ নিয়ে নামলেন, বিশ লাখ টাকা মনে হয় বেশ ভারি, ব্যাগটা টানতে গিয়ে ড্রাইভার চাচা রীতিমতো কুঁজো হয়ে যাচ্ছেন। ইয়েলো ক্যাবের দরজা খুলে মাজহার বের হয়েছে, সে টাকার বস্তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি তৃণাকে বললাম, "তৃণা! তুই যা এখন। ড্রাইভার চাচাকে বলবি আমি ডাকছি।"

তৃণা উঠে তাড়াতাড়ি হেঁটে ড্রাইভার চাচাকে কিছু একটা বলল, ড্রাইভার চাচা চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। আমি ফুটপাতে বসে থেকে হাসি মুখে হাত বাড়লাম।

ড্রাইভার চাচা হতবুদ্ধি হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বস্তা টানতে টানতে আমার দিকে আসতে লাগলেন। তাই দেখে মাজহার যেন খেপে গেলো। সেও এদিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমি চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের সবাই গোল হয়ে মাজহারকে ঘিরে ফেলছে। আমরা মানুষগুলো ছোট হতে পারি কিন্তু সাতজন মানুষের সাথে একজন কখনো পারবে না।

ড্রাইভার চাচা আমার সামনে এসে বললেন, "ছোট সাহেব আপনি? আমরা শুনেছি—"

"ড্রাইভার চাচা সাবধান!" আমার কথা শেষ হবার আগেই মাজহার ঝাঁপিয়ে ব্যাগটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে আমাদের কথা জানে না। কিছু বোঝার আগেই আমরা সাতজন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ইফতি আর কিংশুক দুই পা ধরেছে। টাকার বস্তা ধরার জন্যে তার দুই হাত ব্যস্ত, আমরা অন্য সবাই তার মাঝে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছি। মানুষ একবার পড়ে গেলে খুব বেকায়দায় থাকে—আমরা তার শরীরের নানা জায়গা ধরে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগলাম এবং চোখের পলকে আমাদের ঘিরে একটা ভিড় জমা হয়ে গেলো। কী হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না কিন্তু সাতজন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মিলে একটা মানুষকে ফুটপাতে চেপে ধরে রেখেছে দৃশ্যটি দেখে সবাই ছুটে এলো মানুষটিকে ধরার জন্যে। ট্রাফিক পুলিশ না আসা পর্যন্ত রাস্তার মানুষ কিছু না বুঝেই মাজহারকে যা একটা পিটুনি দিলো সে আর বলার মতো নয়।

ততক্ষণে আব্বু গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এসেছেন, ড্রাইভার চাচা এতো ভিড়ের মাঝেও টাকার বস্তাটা ছাড়েন নি, দুই হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছেন। যখন বুঝতে পারলাম মাজহারের আর পালিয়ে যাবার উপায় নেই তখন তাকে আমরা ছেড়ে দিলাম, পুলিশ এসে তাকে ধরে ফেলে বোঝার চেষ্টা করছে কী হয়েছে।

আব্বু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাজল, তুমি? আমি শুনেছিলাম—"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ আব্বু। আমরা পালিয়ে এসেছি।"

"পা–পালিয়ে এসেছ? কোন সমস্যা হয় নাই তো?"

"না কোন সমস্যা হয় নাই।"

"যদি কোন বিপদ হতো?"

"বিপদ হলে হতো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছাড়া পেতে আমার খুব লজ্জা করল। সেই জন্যে খুব রিস্ক নিয়ে পালিয়ে এলাম।"

"কেন লজ্জা করল?"

"আম্মুর জন্যে। বেচারি আম্মু খুব লজ্জা পেতেন সেই জন্যে!"

আব্বুর মুখটা কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন, "আমি তাহলে কার জন্যে এতো টাকা করেছি?"

আমি বললাম, "আমি জানি না আব্বু। বেঁচে থাকতে বেশি টাকা লাগে না, তুমি শুধু শুধু এতো টাকা করেছ।"

আব্বু অন্যমনস্কের মতো তার টাকার বস্তাটির দিকে তাকালেন, পা দিয়ে বস্তাটিতে ছোট একটা লাথি দিয়ে আবার আমার দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলেন। আমরা দেখতে পেলাম একজন পুলিশ অফিসার এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, "আব্বু, আমরা যাই? আমাদের বাসায় সবাই খুব চিন্তা করছে। তুমি পুলিশকে সব কিছু বুঝিয়ে বলো?"

"কেমন করে যাবি?"

"টেম্পো, স্কুটার কিছু একটা নিয়ে নেব।"

"তোদেরকে ড্রাইভার নামিয়ে দিয়ে আসুক?"

"লাগবে না আব্বু।"

আব্বু আমার দিকে আবার কেমন ভাবে জানি তাকালেন, মনে হলো কিছু একটা বলবেন কিন্তু কিছু বললেন না। আমরা আমাদের ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে এলাম। একটা টেম্পো থেমেছে ছোট একটা বাচ্চা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, "ফার্মগেট ফার্মগেট–ফার্মগেট!"

আমরা ছুটে গিয়ে টেম্পোতে উঠে গেলাম। আব্বু তখনও অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

শেষ কথা

এতো বড় একটা ঘটনার পরেও এটা নিয়ে খুব বেশি হৈচৈ হয় নি। খবরের কাগজে চলে এলে খুব বিপদ হয়ে যেতো—আব্বুর অনেক ক্ষমতা কীভাবে কীভাবে জানি ব্যবস্থা করেছেন যেন কাগজে না আসে। মাজহার আর কাসেম কিছুদিন হাজতে থেকে বের হয়ে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে নাকি শক্ত কেস করা যায় নি। কেস করলেই খালেদ কেমন কেমন করে জানি জড়িয়ে যায়—তাই সেটা নিয়ে কেউ অগ্রসর হলো না।

আমি আর আম্মু ভালই আছি। বলা যায় বেশ ভালোই। কয়দিন আগে মাধুরী খালা জয়ন্ত কাকু কৌশিক আর তার ছোট বোনকে নিয়ে এসেছিলেন। খুব মজা হয়েছিল সেদিন—কৌশিকটা মনে হয় এই কয়দিনে আরো পেকে গেছে, যা পাকা কথা বলতে পারে সে আর বলার নয়।

আব্বু মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন, এসে বেশি কথা বলেন না চুপচাপ বসে থাকেন। আমার মনে হয় তার মাঝে একটা পরিবর্তন আসছে, কী পরিবর্তন সেটা এখনো ঠিক ধরতে পারছি না, সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন। আমার মনে হয় পরিবর্তনটা ভালোই। বেশ ভালোই। দেখা যাক কী হয়।

আমারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বইমেলা থেকে জীবনানন্দ দাশের কবিতাসমগ্র কিনে রূপসী বাংলার কবিতাগুলো মুখস্থ করা শুরু করেছি। এটাও করছি গোপনে কেউ যেন জানতে না পারে। তৃণা তো নয়ই।

সবাই জানে আমি কখনো বিয়ে করবো না, আমি এটা অনেক আগে ঘোষণা করে দিয়েছি। কিন্তু কিছুই তো বলা যায় না, কোন কারণে যদি বিয়ে করেই ফেলতে হয় আর বিয়ের পর আমার বউ যদি দেখে আমি একটা কবিতাও জানি না তাহলে কী লজ্জার ব্যাপার হবে।

তাই একটু আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া ভালো।